অষ্টম সংখ্যা] অগ্রহায়ণ ১৩২১ [প্রথম বর্ষ

সবুজ পত্র

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সবুজ পত্র

বর্ত্তমান সভ্যতা বনাম বর্ত্তমান যুদ্ধ

(১)

বর্ত্তমান যুদ্ধের কার্য্যকারণসম্বন্ধে ইউরোপে যদি কোন বাজে কথা কিম্বা অসঙ্গত কথা বলা হয় তাতে আশ্চর্য্য হবার কোনও কারণ নেই, কেননা মানুষে যখন যুগপৎ ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে, যখন মনে রাগ ও দ্বেষই প্রাধান্য লাভ করে তখন তার পক্ষে বাক্যের সংযম কতক পরিমাণে হারানো স্বাভাবিক।

ঘরে ডাকাত পড়্‌লে তার সঙ্গে মিষ্ট এবং শিষ্ট আলাপ করা সম্ভবতঃ দেবতার পক্ষে স্বাভাবিক, মানুষের পক্ষে নয়; এবং ইউরোপের লোক দেবতা নয়, মানুষ।

কিন্তু এই যুদ্ধব্যাপারটি আমাদের পক্ষে নিরপেক্ষভাবে বিচার কর্‌বার বিশেষ কোনও বাধা নেই। আমরা ও-জালে জড়িয়ে

পড়িনি ; এখন পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে এ ব্যাপারের যা-কিছু যোগ আছে সে শুধু তারের,—নাড়ীর নয়।

ইউরোপে সুরাসুর মিলে যে ভবসমুদ্র মন্থন করছেন—তার ফলে অমৃতই উঠুক আর হলাহলই উঠুক—তার ভাগ আমরাও পাব ; কিন্তু সে ভবিষ্যতে। সে বস্তু পান কর্‌বার পূর্ব্বেই আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম হবার কোনও কারণ নেই। বরং এই অবসরে আমরা যদি ব্যাপারটি ঠিকভাবে দেখতে ও বুঝতে শিখি তাহলে এর ভবিষ্যৎ-ফলাফলের জন্য আমরা অনেকটা প্রস্তুত থাক্‌ব।

এই সমরানলে যে বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাবে সে কথা সত্য। কিন্তু "বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা"র অর্থ যে কি, সে বিষয়ে দেখতে পাই অনেকের তেমন স্পষ্ট ধারণা নেই। এমন কি, কেউ কেউ এই উপলক্ষে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন না।

আমার মতে ইউরোপের প্রতি অবজ্ঞার কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। এ অবশ্য রুচির কথা—সুতরাং এ ক্ষেত্রে মত-ভেদের যথেষ্ট অবসর আছে। মনোভাব প্রকাশ না করলেই যে সে ভাব মন থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায় তা অবশ্য নয়। অথচ এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য যে, আমরা মুখে কি বলি তার চাইতে আমরা মনে কি ভাবি তার মূল্য আমাদের কাছে ঢের বেশি ; কেননা, সত্যের জ্ঞান না হলে মানুষে সত্য কথা বল্‌তে পারে না।

প্রথমতঃ কি স্বদেশী, কি বিদেশী, কি নবীন, কি প্রাচীন কোন সভ্যতাকেই এক-কথায় উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

একটি বিপুল মানব-সমাজের পক্ষে কিম্বা বিপক্ষে ও-রকম

এক-তরফা ডিক্রি দেওয়ার নাম বিচার নয়। বহু মানবে বহু দিন ধরে কায়মনোবাক্যে যে সভ্যতা গড়ে তুলেছে তার ভিতর যে মনুষ্যত্ব নেই এ কথা বল্‌তে শুধু তিনিই অধিকারী যিনি মানুষ নন। অপর পক্ষে "চরম সভ্যতা" বলে কোনও পদার্থ মানুষে আজ পর্য্যন্ত সৃষ্টি কর্‌তে পারেনি এবং কখনও পার্‌বে না। কেননা, পৃথিবী যে দিন স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠবে সে দিন মানুষের দেহমনের আর কোনও কার্য্য থাক্‌বে না—কাজেই মানুষ তখন চিরনিদ্রা উপভোগ কর্‌তে বাধ্য হবে। অন্ততঃ পৃথিবীতে এমন কোনও সভ্যতা আজ পর্য্যন্ত হয়নি—যা একেবারে নির্গুণ কিম্বা একেবারে নির্দ্দোষ। কোনও একটি বিশেষ সভ্যতার বিচার করবার জন্য তার দোষগুণের পরিচয় নেওয়া আবশ্যক,—মনকে খাটানো দরকার। যখন আমরা আলস্যে অভিভূত হয়ে হাই তুলি তখনই আমরা তুড়ি দিই, সুতরাং আমরা যখন তুড়ি দিয়ে কোন জিনিষ উড়িয়ে দিতে চাই তখন আমরা মানসিক আলস্য ব্যতীত অন্য কোনও গুণের পরিচয় দিই না। এ সত্য অবশ্য চিরপরিচিত কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পৃথিবীতে যা চির-পরিচিত তাই চির-উপেক্ষিত।

(২)

ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, যে মনোভাবের উপর সে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত এই মহাসমর হচ্ছে তার স্বাভাবিক পরিণতি; কেননা, এ যুগে ইউরোপ ধর্ম্মপ্রাণ নয়, কর্ম্মপ্রাণ,—সে দেশে আজ আত্মার অপেক্ষা বিষয়ের, মনের অপেক্ষা

ধনের মাহাত্ম্য ঢের বেশী। শিল্পবাণিজ্যের পরিমাণ-অনুসারেই ইউরোপে জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপ করা হয় এবং সে দেশের লোকের বিশ্বাস যে, মানবের ভ্রাতৃভাব নয় ভ্রাতৃবিরোধই হচ্ছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভ্যুদয়ের একমাত্র উপায়। অতএব এই যুদ্ধ হচ্ছে ইউরোপের আজ একশ বৎসরের কর্ম্মফল।

এ অভিযোগের মূলে যে কতকটা সত্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু কতটা—তাই হচ্ছে বিচার্য্য।

আমরা মানবসভ্যতাকে সচরাচর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করি—প্রাচীন ও নবীন। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোনও বর্ত্তমান সভ্যতা নেই যা অনেক অংশে প্রাচীন নয়। যেমন আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতা কিম্বা অসভ্যতা এক-অংশে প্রাচীন হিন্দু এবং আর-এক-অংশে নব্য ইউরোপীয়—তেমনি ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা আট আনা নতুন হলেও আট আনা পুরোনো। সুতরাং এই যুদ্ধের জন্য ইউরোপের নব-মনোভাবকে সম্পূর্ণ দায়ী করা যেতে পারে না, বরং তার পূর্ব্ব-সংস্কারকেই এর জন্য দোষী করা অসঙ্গত হবে না।

মানুষে মানুষে কাটাকাটি মারামারি করা যদি অসভ্যতার লক্ষণ হয় তাহলে ইউরোপের বর্ত্তমান যুগের অপেক্ষা মধ্যযুগ ঢের বেশি অসভ্য ছিল। সে যুগে যুদ্ধপার্ব্বণ বারো মাসে তের বার হত এবং সে কালের মতে 'ওকার্য্যটি নিত্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল। মধ্যযুগকে ইউরোপীয়েরা কৃষ্ণযুগ বলেন—কিন্তু আসলে সেটি রক্তযুগ। আমরা আমাদের বর্ত্তমান মনোভাববশতঃই যুদ্ধকার্য্যটি হেয় মনে করি—প্রাচীন মনোভাব থাকলে শ্রেয়ঃ মনে

করতুম। ইউরোপের নবযুগ অবশ্য একহিসাবে যন্ত্রযুগ কিন্তু তাই বলে মধ্যযুগ যে মন্ত্রযুগ ছিল, তা নয়। যে হিসাবে মধ্যযুগ ধর্ম্মপ্রাণ ছিল সে হিসাবে নবযুগ ধর্ম্মপ্রাণ নয়। সে হিসাবটি যে কি, তা একটু পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক।

বৌদ্ধধর্ম্মের মত খৃষ্টধর্ম্মেরও ত্রিরত্ন আছে;—সে হচ্ছে খৃষ্ট, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ; এবং খৃষ্টিয়ানমাত্রেই নামমাত্র এই তিনের স্মরণ গ্রহণ করেন। কিন্তু যুগভেদে এই তিনের মধ্যে একএকটি রত্ন সর্ব্বাপেক্ষা মহামূল্য হয়ে উঠে।

প্রথম যুগে (Primitive Christianity) খৃষ্টিয়ানের পক্ষে খৃষ্টই ছিল শরণ্য। মধ্যযুগে খৃষ্টের স্থান খৃষ্ট-সঙ্ঘ অধিকার করেন এবং ইউরোপের মনোরাজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করেন; সে সঙ্ঘ সে আধিপত্যের ভাগ খৃষ্টকেও দেন নি, ধর্ম্মকেও দেন নি। প্রায় একহাজার বৎসর ধরে খৃষ্ট-সংঘ মানবের বুদ্ধি ও আত্মাকে সমান অভিভূত করে রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, সাংসারিক হিসাবেও এই সঙ্ঘ ইউরোপের রাজরাজেশ্বর হয়ে উঠেছিলেন। এই সঙ্ঘ মানুষের তনমনধনের উপর এই অসীম প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ধর্ম্মের নামে কত যে অধর্ম্ম-যুদ্ধের প্রবর্ত্তন করেছেন তার প্রমাণ মধ্যযুগের ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়।

এই সঙ্ঘের ধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম এক বস্তু নয়। সুতরাং এই সংঘের দাসত্ব হতে মুক্তিলাভ করে ইউরোপের যে ধর্ম্মজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে এ কথা বলা চলে না। বরং পূর্ব্বের অপেক্ষা বর্ত্তমানে ইউরোপীয়দের যে ধর্ম্মবুদ্ধি (conscience) অধিক জাগ্রত হয়ে

উঠেছে তার প্রমাণ ইউরোপের সকল আইনকানুনে, সকল সমাজব্যবস্থায় পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের অন্ধ কারাগার আপনি ভেঙ্গে পড়ে নি; মানবমনের একটির পর আর-একটি তিনটি প্রবল ধাক্কায় তার পাষাণ-প্রাচীর বিদীর্ণ হয়েছে। সে তিন হচ্ছে—ইতালির রেনেসাঁস্, জর্ম্মানীর রিফর্‌মেশান এবং ফ্রান্সের রেভলিউসান।

গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সভ্যতার স্পর্শে ইতালি যে-দিন নবজীবন লাভ কর্‌লে সেই দিন ইউরোপে নবসভ্যতার সূত্রপাত হল। এই প্রাচীন সাহিত্যের আবিষ্কারের সঙ্গে মানুষ নিজের শক্তি ও বাহিরের সৌন্দর্য্য আবিষ্কার কর্‌লে। মানুষ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের চোখ দিয়ে দেখ্‌তে এবং নিজের বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে শিখলে। মানুষের পক্ষে তার এই নব-আবিষ্কৃত অন্তর্নিহিত শক্তির চর্চ্চাই তার প্রধান কর্ত্তব্য হয়ে উঠল। যে প্রকৃতিকে ইউরোপীয়েরা হাজার বৎসর ধরে বিমাতা মনে করে আসছিল, তাকে তারা সেবাদাসীতে পরিণত কর্‌তে ব্যগ্র হয়ে উঠল। এই নবজীবন—শিল্পে, বিজ্ঞানে, কাব্যে, ইতিহাসে, বিকশিত হয়ে উঠল। এককথায় নবজীবন লাভ করে মানুষের চোখ-কান ফুটল এবং হাত-পায়ের খিল খুলে গেল।

এর পরবর্ত্তী যুগে জর্ম্মানী বাইবেলের আবিষ্কারের সঙ্গে নিজের আত্মারও আবিষ্কার কর্‌লে;—মানুষে এই সত্যের পরিচয় পেলে যে, ধর্ম্মের মূল তার নিজের অন্তরে, ধর্ম্মযাজকের মুখে নয়। খৃষ্টের ধর্ম্মের পরিচয় লাভ করে মানুষে খৃষ্টসঙ্ঘের সংস্কারের জন্য উৎসুক হয়ে উঠল। জর্ম্মানীর এই নবসংস্কারের গুণে ইউরোপের

মানবশক্তি আবার অন্তর্মুখী হল। মানুষে আত্মদর্শনের জন্য লালায়িত হয়ে উঠল।

এই রেনেসাঁসের ফলে ইউরোপে মানুষের কর্ম্মবুদ্ধি এবং এই রিফরমেশনের ফলে তার ধর্ম্মবুদ্ধি মুক্তিলাভ করলে; কিন্তু তার সামাজিক জীবনের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন ঘটল না।

তার পর ফ্রান্সের বিপ্লবের ফলে ইউরোপীয় মানব মধ্য-যুগের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করে জীবনেও স্বাধীনতা লাভ করলে। সুতরাং ইউরোপের নবযুগের সভ্যতায় মানুষ তার মনুষ্যত্ব ফিরে পেলে,—হারাল না। যে মনোভাবের উপর এ সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত তা শান্তির পক্ষে অনুকূল বই প্রতিকূল নয়। সামাজিক স্বাধীনতা যে সামাজিক মৈত্রীর প্রতিবন্ধক নয় তার প্রমাণ এই যুদ্ধেই পাওয়া যায়। আজ দেখা যাচ্ছে যে, ইউরোপের একএকটি জাতি যেন একএকটি ব্যক্তিস্বরূপ হয়ে উঠেছে; মধ্যযুগে এরূপ একজাতীয়তার ভাব মানুষের কল্পনারও অতীত ছিল।

(৩)

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, কোন যুগের কোনও সভ্যতা একেবারে নির্দ্দোষ কিম্বা একেবারে নির্গুণ নয়। ইউরোপের মধ্যযুগের স্বপক্ষে যে কিছু বলবার নেই তা নয়। অন্ধকারেরও একটা অটল সৌন্দর্য্য আছে এবং তার অন্তরেও গুপ্ত শক্তি নিহিত থাকে। যে ফুল দিনে ফোটে, রাত্রে তার জন্ম হয়—এ কথা আমরা সকলেই জানি। সুতরাং নবযুগে যে সকল মনোভাব প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে তার অনেকগুলির বীজ মধ্যযুগে বপন করা হয়েছিল।

কিন্তু নবযুগের অলোক না পেলে সে সকল বীজ বড়জোর অঙ্কুরিত হত,—তার বেশী নয়।

ইউরোপের নবসভ্যতার আলোক, সূর্য্যের আলো নয় যে তা কেউ নেবাতে পারে না। এ আলো প্রদীপের আলো, আকাশ থেকে পড়ে নি, মানুষে নিজহাতে রচনা করেছে; সুতরাং ইউ-রোপের নিশাচররা এ আলো নেবাবার বহু চেষ্টা করেছে। মধ্যযুগের সঙ্গে পদে পদে লড়াই করে নবযুগকে অগ্রসর হতে হয়েছে। Reformationকে আত্মরক্ষার জন্য প্রায় দেড়শ বৎসর অবিরাম যুদ্ধ করতে হয়েছে। ফরাসী-বিপ্লব আত্মরক্ষার জন্য যে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয় তা ইউরোপময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। "স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর" মন্ত্রে দীক্ষিত নেপোলিয়ন—সমগ্র ইউরোপকে প্রায় নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। স্বাধীনতার অবতার পরের স্বাধীনতা অপহরণ করা, মৈত্রীর অবতার পরের শত্রুতা করা এবং সাম্যের অবতার যে ইউরোপের একেশ্বর হওয়া তাঁর জীবনের ব্রত করে তুলেছিলেন একথা মনে করলে মানবসভ্যতা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়তে হয়। কিন্তু আমরা আজ একশ বৎসর পরে নেপোলিয়ানের এই বিরাট দস্যুতার বিচার করে দেখতে পাই যে, তার সুফল হয়েছে এই যে, ফরাসী রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমগ্র ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর তার কুফল হয়েছে এই যে, সেই সঙ্গে নেপোলিয়ানের militarismও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের প্রবল সংঘর্ষে যে অমৃত ও হলাহল উত্থিত হয়েছে—ইউরোপের সকল জাতির দেহ ও মনে তার অল্প-বিস্তর প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রধান সমস্যাই এই যে, কি-উপায়ে সভ্য সমাজের দেহ এই বিষমুক্ত করা যেতে পারে।

(৪)

এ সমস্যা অতি গুরুতর সমস্যা—কেননা, এক-পক্ষে যেমন ইউরোপের সভ্যজাতিদের মনে যুদ্ধ কর্‌বার প্রবৃত্তি কমে এসেছে, —অপর পক্ষে তাদের জীবনে পরস্পর যুদ্ধ করবার নূতন কারণেরও সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণে ইউরোপের মুখে শান্তিবচন এবং হাতে অস্ত্র।

সকলেই জানেন যে, শিল্প ও বাণিজ্যই হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান আশ্রয়স্থল। শিল্পবাণিজ্যের সাহায্যে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করার অর্থ হচ্ছে নিজের পরিশ্রমে জীবিকা অর্জ্জন করা। আর যুদ্ধের দ্বারা অন্নবস্ত্র সংগ্রহ করার অর্থ হচ্ছে পরের পরিশ্রমের ফল উপভোগ করা। এ দুটি মনোভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। এই কারণেই সকল দেশে সকল যুগেই দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে অবজ্ঞা করে এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়কে ভয় করে। যে জাতির অধিকাংশ লোক শিল্পবাণিজ্যে ব্যাপৃত—সে জাতির যুদ্ধে প্রবৃত্তি না থাকাই স্বাভাবিক।

তার পর, শিল্পবাণিজ্যের পক্ষে যুদ্ধের ন্যায় ক্ষতিকর ব্যাপার আর নেই। যুদ্ধ যে মানুষের সকল কাজকর্ম্ম, সকল বেচাকেনা একদিনেই বন্ধ করে দেয়—তার প্রমাণ ত আজ হাতে হাতেই পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং, যুদ্ধ জিনিষটি ইউরোপীয়দের স্বার্থের বিরোধী। আর এক কথা, হার্বার্টস্পেনসরপ্রমুখ দার্শনিকেরা

আশা করেছিলেন যে, বর্ত্তমান ইউরোপের বৈশ্যসভ্যতা পৃথিবীতে চিরশান্তি স্থাপন কর্‌বে। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, বাণিজ্যের যোগসূত্র পৃথিবীর সকল জাতির সখ্যসূত্রে পরিণত হবে। এই অন্নবস্ত্রের অবাধ আদান-প্রদানের ফলে প্রতি জাতির কাছেই বসুধা কুটুম্ব হয়ে উঠবে। এই কারণে এই শ্রেণীর দার্শনিকদের মতে ক্ষত্রিয় যুগের অপেক্ষা বৈশ্যযুগের সভ্যতা মানব-ইতিহাসের উন্নত স্তরের সভ্যতা। হার্বার্টস্পেনসরের এই আশা যে, কবি-কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয় তার প্রমাণ আজ পাওয়া যাচ্ছে। আজ দেখা যাচ্ছে যে, আগে যেমন রাজ্য নিয়ে রাজায় রাজায় লড়াই কর্‌ত, আজ তেমনি বাণিজ্য নিয়ে জাতিতে জাতিতে লড়াই কর্‌ছে এবং এ লড়াই অতি ভীষণ এবং অতি নিষ্ঠুর। কারণ আগে মানুষ হাতে যুদ্ধ করত, এখন কলে যুদ্ধ করে। এই কারণেই বর্ত্তমান যুদ্ধ নিতান্ত অমানুষী ব্যাপার, কেননা বাহু-বলের ভিতর মনুষ্যত্ব আছে কিন্তু যন্ত্রবলের ভিতর নেই। কিন্তু এ সত্ত্বেও এ কথা সত্য যে, বৈশ্যসভ্যতা যুদ্ধের অনুকূল নয়, কেননা যুদ্ধ বৈশ্যধর্ম্মের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

(৫)

ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স যে আত্মরক্ষা ব্যতীত অপর কোনও কারণে যুদ্ধ করাটা অকর্ত্তব্য মনে করে সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোনও বৈধ কারণ নেই। ইউরোপের নবযুগের নবসভ্যতার যথার্থ উত্তরাধিকারী হচ্ছে এই দুটি দেশ। ইংরাজ ও ফরাসী উভয়েই ক্ষত্রিয়যুগ উত্তীর্ণ হয়ে বৈশ্যযুগে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সুতরাং

এঁদের দেহে রণসজ্জা থাকলেও মনে খাঁটি militarism নেই। অপর পক্ষে জর্ম্মানী হচ্ছে যুদ্ধপ্রাণ ; militarism—জর্ম্মানীর যুগপৎ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। বর্ত্তমান জর্ম্মানীর এরূপ মনোভাবের জন্য দায়ী জর্ম্মানীর পূর্ব্ব-ইতিহাস।

প্রায় আটশত বৎসর ধরে ইউরোপে জর্ম্মানজাতির কোনরূপ প্রভুত্ব ছিল না—তার কারণ জর্ম্মানরা এই দীর্ঘকালের ভিতর একটি জর্ম্মান-রাজ্য কিম্বা একটি জর্ম্মানজাতি গড়ে তুল্‌তে পারে নি। যে কালে ইংলণ্ড, ফ্রান্সপ্রভৃতি দেশ স্বাতন্ত্র্য এবং স্বরাজ্য লাভ করেছিল সে কালে জর্ম্মানী শত শত পরস্পর-বিরোধী খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। এ কতকটা জর্ম্মানীর কপালের দোষে, কতকটা তার বুদ্ধির দোষে। জর্ম্মানী সমগ্র ইউরোপের সম্রাট হবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করত বলে, স্বদেশেও একরাট হতে পারে নি।

কোনও কোনও বৌদ্ধদেশে দুটি করে রাজা থাকেন ;—একজন প্রকৃতিপুঞ্জের আত্মার প্রভু, আর-একজন দেহের। মধ্যযুগের প্রথম ভাগে সমগ্র ইউরোপীয় মানবকে এইরূপ দুইছত্রের অধীন করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। পোপ ইউরোপের ধর্ম্মরাজের পদ এবং জর্ম্মানরাজ দেবরাজের পদ অধিকার করে বসেছিলেন। ইউরোপ একটি মহাদেশ এবং ইউরোপীয়েরা নানা বিভিন্ন জাতীয় সুতরাং ঐহিক কিম্বা পারত্রিক কোনও বিষয়ে একজাতি হওয়া যে তাদের পক্ষে অসম্ভব—এ কথা পোপও স্বীকার করেন নি, জর্ম্মান-সম্রাটও স্বীকার করেন নি। জর্ম্মানজাতি যে ইউরোপের অন্যান্য জাতি হতে মনে ও চরিত্রে পৃথক এ সত্য উপেক্ষা করবার

ফলে জর্ম্মানী ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়্‌ল। স্বদেশ এবং স্বজাতির উপর কোনরূপ একাধিপত্য না থাক্‌লেও জর্ম্মান-সম্রাট তাঁর সম্রাট-পদবী এবং সাম্রাজ্যের আশা ত্যাগ কর্‌তে পারলেন না, এবং স্বজাতিকে নিয়ে একটি স্বরাজ্য গঠন করবার চেষ্টামাত্রও করলেন না। এই কারণে জর্ম্মানজাতির পূর্ব্বে কোনরূপ রাষ্ট্রশক্তি ছিল না। অথচ জর্ম্মানজাতির ভিতর কি দেহের, কি বুদ্ধির, কি চরিত্রের কোনরূপ বলের যে অভাব ছিল না—জর্ম্মান কাব্যদর্শনে শিল্পে সঙ্গীতে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে জর্ম্মানীর মহাপুরুষেরা লৌকিকরাজ্যের আশা ত্যাগ করে চিন্তারাজ্য অধিকার করাই নিজেদের কর্ত্তব্য বলে মেনে নিলেন। সম্ভবতঃ জর্ম্মানজাতির ইতিহাস অদ্যাবধি ঐ একই পথ অনুসরণ করে চল্‌ত—যদি নেপোলিয়ান জর্ম্মানজাতিকে আকাশ থেকে টেনে মাটিতে ফেলে পদদলিত না কর্‌তেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে Jenaর যুদ্ধে পরাজিত এবং লাঞ্ছিত হবার পর জর্ম্মানমাত্রেরই এ জ্ঞান জন্মাল যে, জর্ম্মানীর খণ্ডরাজ্য সকলকে একত্র করে একটি যুক্তরাজ্যে পরিণত না কর্‌তে পার্‌লে জর্ম্মানজাতির পক্ষে তার অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়্‌বে।

অসংখ্য দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, অধ্যাপকপ্রভৃতি চিরজীবন প্রাণপণ চেষ্টা করেও এ ব্রত উদ্‌যাপন কর্‌তে পারেন নি; কিন্তু আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে Bismarck দুটি যুদ্ধের সাহায্যে জর্ম্মানজাতির প্রাণের আশা ফলে পরিণত করে-ছিলেন। বিসমার্ক অষ্ট্রীয়াকে পরাভূত করে উত্তর জর্ম্মানীর এবং ফ্রান্সকে পরাভূত করে দক্ষিণ জর্ম্মানীর যোগসাধন

করেন। বিসমার্ক বলতেন যে, রক্ত ও লৌহের রসান্ দিয়ে তিনি ভাঙ্গা জার্ম্মানীকে যোড়া দিয়েছেন। সুতরাং যুদ্ধের দ্বারা যে রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে, যুদ্ধের দ্বারাই তার রক্ষা এবং যুদ্ধের দ্বারাই তার উন্নতি সাধন করতে হবে—এই হচ্ছে নবজর্ম্মানীর দৃঢ়ধারণা।

যুদ্ধকার্য্য অপ্রিয় হলেও আত্মরক্ষার্থ যে তা করা কর্ত্তব্য এ বিষয়ে ইংরাজ ফরাসীপ্রভৃতি ইউরোপের অগ্রগণ্য জাতির মধ্যে কোনও মতভেদ নেই। জর্ম্মানদের সঙ্গে আর-সকলের প্রভেদ এইখানে যে, জর্ম্মানীর কর্ত্তৃপক্ষদের মতে জাতীয় উন্নতির পথ পরিষ্কার করবারও একমাত্র উপায় হচ্ছে তরবারি।

জর্ম্মানীর যোদ্ধাদলের মুখপাত্র জেনারেল বেয়ারণ হার্ডি অতি স্পষ্টাক্ষরে দুনিয়ার লোককে, জর্ম্মান রাষ্ট্রনীতির মূল কথা জানিয়ে দিয়েছেন। সে কথা এই ঃ—জর্ম্মানজাতি গত ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে শিল্পবাণিজ্যে যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তার থেকেই প্রমাণ হয় যে, কি বাহুবলে, কি বুদ্ধিবলে সে জাতির সমকক্ষ দ্বিতীয় জাতি পৃথিবীতে নেই। জর্ম্মানীর শ্রীবৃদ্ধি তার বাণিজ্যবিস্তারের উপর নির্ভর করে। যদিচ ভবের হাটে কেনা-বেচার জন্য জর্ম্মানজাতিই হচ্ছে জ্যেষ্ঠ অধিকারী—তবুও এ ক্ষেত্রে সকলের শেষে উপস্থিত হওয়ার দরুণ সে আজ সর্ব্বকনিষ্ঠ, কেননা পৃথিবীর সকল হাটবাজার আজ অপরের সম্পত্তি। পরের হাটে কেনাবেচা করার অর্থ পরভাগ্যোপজীবী হওয়া; সুতরাং এ পৃথিবীতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করবার জন্য জর্ম্মানী অপরের সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নিতে বাধ্য। যুদ্ধ ব্যতীত অপর কোন

উপায়ে জর্ম্মানীর পক্ষে তার জাতীয় স্বার্থসাধন করা অসম্ভব। অতএব militarism হচ্ছে নবজর্ম্মানীর একমাত্র ধর্ম্ম।

জেনেরাল বেয়ারণ হার্ডি যে স্পষ্টবাদী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দস্যুতাকে ধর্ম্ম বলে প্রচার কর্‌তে লোকে সহজেই কুণ্ঠিত হয়। ওরূপ মনোভাব প্রকাশ কর্‌তে হলে অপর দেশের লোকে অনেক বড় বড় নীতির কথায় তাকে চাপা দেয়।

কিন্তু জর্ম্মান-রাজমন্ত্রী কিম্বা জর্ম্মান-রাজসেনাপতির পক্ষে এ বিষয়ে কোনরূপ কপটতা কর্‌বার প্রয়োজন নেই—কেননা, জর্ম্মানীর রাজ-গুরুপুরোহিতেরা যে নবশাস্ত্র রচনা করেছেন—জর্ম্মানীর রাজ-পুরুষদের রাজনীতি সেই শাস্ত্রসঙ্গত।

জর্ম্মান বৈজ্ঞানিকদের মতে ডারউইনের আবিষ্কৃত ইভলিউসনের নির্গলিতার্থ হচ্ছে—"জোর যার মুলুক তার"। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন কর্‌লে মানুষে শুধু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীবনটা যখন একটা মারামারি কাটাকাটি ব্যাপার তখন যে মার্‌তে প্রস্তুত নয় তাকে মর্‌তে প্রস্তুত হতে হবে—এই হচ্ছে বিধির নিয়ম। ইভলিউসানের এই ব্যাখ্যা, Nietzsche-নামক একটি প্রতিভাশালী লেখক সমগ্র জর্ম্মানজাতিকে গ্রাহ্য করিয়েছেন। Neitzschea মতে দয়া মমতা পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি মনোভাব মানসিক রোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়, কেননা এ সকল মনোভাবের প্রশ্রয় দেওয়াতে মানুষের প্রকৃতি দুর্ব্বল হয়ে পড়ে; এবং দুর্ব্বলতাই হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র পাপ এবং সবলতাই এক মাত্র পুণ্য;—শক্তিই হচ্ছে একমাত্র সত্য শিব ও সুন্দর। ইউরোপীয় মানব যে এই সহজ সত্য ভুলে গেছল তার কারণ

ইউরোপ খৃষ্টধর্ম্মনামক রোগে জর্জ্জরিত। খৃষ্টধর্ম্ম যে এসিয়ায় জন্মলাভ করেছে তার কারণ—এসিয়াবাসীরা দাসের জাতি, সুতরাং তাদের সকল ধর্ম্মকর্ম্ম দাসমনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই এসিয়ার cancer ইউরোপের দেহ হতে সমূলে উৎপাটিত করতে হলে অস্ত্রচিকিৎসা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ইউরোপের নব-যুগের সাম্য মৈত্রীপ্রভৃতি মনোভাব ঐ প্রাচীন রোগের নূতন উপসর্গ মাত্র। সুতরাং ফরাসী ইংরাজপ্রভৃতি যে সকল জাতির দেহে এই সকল রোগের লক্ষণ দেখা যায় তাদের উচ্ছেদ করা জর্ম্মান ক্ষত্রিয়দের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। Nietzscheর এই মত জর্ম্মানজাতির মনে যে বসে গেছে তার কারণ Nietzsche কালি-কলমে লেখেন নি, তার প্রতি অক্ষর বাটালি দিয়ে খোদা।

জর্ম্মানপণ্ডিতদের মত—কেবলমাত্র জাতীয় স্বার্থের জন্য নয়, লোক-হিতের জন্যও, জর্ম্মানীর পক্ষে দিগ্বিজয় করা আবশ্যক। জেনেরাল বেয়ারণহার্ডি বলেন german labour এবং german idealismএর প্রচার ব্যতীত মানবজাতির উদ্ধার হবে না। সুতরাং যেমন তরবারির সাহায্যে পৃথিবীশুদ্ধ লোককে জর্ম্মান মাল গ্রাহ্য করাতে হবে তেমনি ঐ একই উপায়ে জর্ম্মান তত্ত্বকথাও গ্রাহ্য করাতে হবে। এই হচ্ছে জর্ম্মানীর বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম।

এস্থলে জর্ম্মান-idealism এর অর্থ কাণ্টপ্রভৃতির দর্শন নয়; কেননা, বেয়ারনহার্ডি কাণ্টপ্রমুখ দার্শনিকদের অতি অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। বেয়ারনহার্ডির মতে এই সকল বাহ্যজ্ঞানশূন্য বিষয়-বুদ্ধিহীন দার্শনিকদের অমার্জ্জনীয় অপরাধ এই যে, তারা বিশ্বমানবের কাছে শান্তির বারতা ঘোষণা করেছিলেন। জর্ম্মানী আজ তাই

তার নব-idealism প্রচার কর্‌তে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। আধ্যাত্মিক জগতে নব্য-পন্থীদের সার কথা এই যে, বৈশ্য সভ্যতায় মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে। বৈশ্য-যুগে মানুষ আরামপ্রিয় ও ভোগবিলাসী হয়ে পড়ে। মানুষ বিষয়প্রাণ হলে তার মনের শক্তি ও আত্মার শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা যে আত্মার অপেক্ষা দেহকে প্রাধান্য দেয় তার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে—মানবজীবনকে যতদূর সম্ভব নিরাপদ করে তোলাই এ সভ্যতার প্রধান লক্ষ্য। ভয় না থাক্‌লে ভক্তি থাকে না, অথচ বর্ত্তমান সভ্যতা জনসাধারণকে রাজভয় দস্যুভয় ও মৃত্যুভয় এই ত্রিবিধ ভয় থেকে মুক্ত করেছে। অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা অবশ্য জীবনধারণের জন্য আবশ্যক কিন্তু অর্থকেই জীবনের সার পদার্থ করে তুললে মানুষ অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়ে। সুতরাং মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষা করবার জন্য সামাজিক জীবন আবার বিপদসঙ্কুল করে তোলা দরকার। এ যুগে এক যুদ্ধব্যতীত অপর কোনও উপায়ে সে উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। অতএব ইউরোপীয় সমাজকে পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয় শাসনাধীন করা আবশ্যক; কেননা, বৈশ্যবুদ্ধি যুদ্ধের প্রতিকূল। এবং ইউরোপের রাজনীতি ক্ষাত্রধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার ক্ষমতা একমাত্র জর্ম্মানীর আছে; কেননা জর্ম্মানীর বৈশ্যশূদ্রের আজও কোনরূপ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নেই। সুতরাং অর্থরাজ্যের উচ্ছেদ করে পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্যের সংস্থাপন কর্‌বার ভার জর্ম্মানীর হাতে পড়েছে। এই কারণে যুদ্ধ করা জর্ম্মানীর পক্ষে সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। জর্ম্মানীর নব-militarismএর প্ররোচনাই এই যুদ্ধের সাক্ষাৎ কারণ।

এই বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক militarism ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতার অনুবাদ নয়, প্রতিবাদমাত্র। জর্ম্মানীর পরশ্রীকাতরতাই এর যথার্থ মূল, এবং এ মূল জর্ম্মানীর প্রাচীন ইতিহাস থেকে রস সঞ্চয় করে। জর্ম্মানীর বর্ত্তমান উচ্চ আশার ভাষা নতুন হলেও তার ভাব পুরাতন। মধ্যযুগে জর্ম্মানী একবার ইউরোপের সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তিত্ব পদ লাভ কর্‌বার চেষ্টা করে অকৃতকার্য্য হয়েছিল; আশা করি এবারেও হবে। জর্ম্মানজাতির যথেষ্ট বাহুবল বুদ্ধিবল ও চরিত্রবল আছে কিন্তু বিসমার্কের হাতে-গড়া জর্ম্মান-সাম্রাজ্যের অন্তরে নৈতিক বল নেই; সুতরাং জর্ম্মানীর দিগ্বিজয়ের আশা দুরাশা মাত্র। এ যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক, ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতাকে এর জন্য দায়ী করা যেতে পারে না; কারণ militarism সে সভ্যতার গৃহশত্রু।

ইউরোপের সকলজাতির দেহেই এই militarism অল্পবিস্তর স্থান লাভ করেছে; একমাত্র জর্ম্মানী তা পূর্ণমাত্রায় অঙ্গীকার করেছে। যা অপর সকল জাতির অন্তরে বাষ্পাকারে বিরাজ করছে জর্ম্মানীতে তা জমে বরফ হয়ে গেছে। সুতরাং এই সমরানলে এই বরফের কাঠিন্যের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাবে। যদি এই অগ্নিতে militarism ভস্মসাৎ হয় তাহলে যে, কেবল অপরজাতি সকলের মঙ্গল হবে শুধু তাই নয়, জর্ম্মানীও পরিবর্দ্ধিত না হোক, সংশোধিত হবে। যে জাতি মানবাত্মার সঙ্গে ইউরোপের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, যে দেশে কাণ্ট, হেগেল, গেটে, শিলার, বেটোভেন, মোজার্ট জন্মলাভ করেছে, সে জাতির কাছে ইউরোপীয় সভ্যতা চিরঋণী। এই militarismএর

মোহমুক্ত হলে সে জাতি আবার মানবসভ্যতার প্রবল সহায় হবে।

Militarism হেয় বলে বর্ত্তমান বৈশ্যসভ্যতাই যে শ্রেয় একথা আমি বল্‌তে পারি নে। কোন সভ্যতাই নিরাবিল ও নিষ্কলুষ নয়,—বৈশ্য সভ্যতাও নয়। তবে কোনও বর্ত্তমান সভ্যতার দোষগুণ বিচার কর্‌তে হলে তার অতীতের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি রাখা চাই, তার ভবিষ্যতের প্রতিও তদ্রূপ দৃষ্টি রাখা চাই। বর্ত্তমান যে, অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিস্থলমাত্র—এ কথা ভোলা উচিত নয়। বর্ত্তমানের যে-সকল দোষ স্পষ্ট লক্ষিত হচ্ছে ভবিষ্যতে তার নিরাকরণ হবার আশা আছে কি না, এ সভ্যতা স্বীয় শক্তিতে স্বীয় রোগমুক্ত হতে পারবে কি না,—এই হচ্ছে আসল জিজ্ঞাস্য। আমার বিশ্বাস, বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার সে শক্তি আছে। সে যাইহোক, বৈশ্যসভ্যতার রোগ-সারাবার বৈধ উপায় হচ্ছে মন্ত্রৌষধির প্রয়োগ,—জর্ম্মানীর অস্ত্রচিকিৎসা নয়।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

ছবি

তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা ?
—ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভীড়
আকাশের নীড় ;
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো-হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি
তুমি কি তাদেরি মত সত্য নও ?
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি ?

চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও ?
পথিকের সঙ্গ লও
ওগো পথহীন !
কেন রাত্রিদিন
সকলের মাঝে থেকে সবা হতে আছ এত দূরে
স্থিরতার চির অন্তঃপুরে ?

এই ধূলি
ধূসর অঞ্চল তুলি
বায়ুভরে ধায় দিকে দিকে ;
বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে ;
অঙ্গে তার পত্রলিখা দেয় লিখে
বসন্তের মিলন-ঊষায়—
এই ধূলি এও সত্য হায় ;—
এই তৃণ
বিশ্বের চরণতলে লীন
এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবি,—
তুমি স্থির, তুমি ছবি,
তুমি শুধু ছবি !

একদিন এই পথে চলেছিলে আমাদের পাশে।
বক্ষ তব দুলিত নিশ্বাসে ;
অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব
কত গানে কত নাচে
রচিয়াছে
আপনার ছন্দ নব নব
বিশ্বতালে রেখে তাল ;
সে যে আজ হল কতকাল !

এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে !
মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি রসের মূরতি।
সে প্রভাতে তুমিই ত ছিলে
এ বিশ্বের বাণী মূর্ত্তিমতী।

একসাথে পথে যেতে যেতে
রজনীর আড়ালেতে
তুমি গেলে থামি।
তার পরে আমি
কত দুঃখে সুখে
রাত্রিদিন চলেছি সম্মুখে।
চলেছে জোয়ার ভাঁটা আলোকে আঁধারে
আকাশ-পাথারে ;
পথের দু'ধারে
চলেছে ফুলের দল নীরব চরণে
বরণে বরণে ;
সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।

অজানার সুরে
চলিয়াছি দূর হতে দূরে,
মেতেছি পথের প্রেমে।
তুমি পথ হতে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে।
এই তৃণ, এই ধূলি—ওই তারা, ওই শশিরবি
সবার আড়ালে
তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি!

কি প্রলাপ কহে কবি?
তুমি ছবি?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি!
কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে?
মরি মরি সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ;
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।
তোমার চিকণ
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত

তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্ম্মর-মুখর ছায়া মাধবীবনের
হত স্বপনের।
তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে ?
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল।
অন্যমনে চলি পথে, ভুলিনে কি ফুল ?
ভুলিনে কি তারা ?
তবুও তাহারা
প্রণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতামাঝে ভরি দেয় সুর।
ভুলে থাকা নয় সে ত ভোলা ;
বিস্মৃতির মর্ম্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।
নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই ;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে ;

কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি !
তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তার পরে হারায়েছি রাতে।
তার পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।
নও ছবি, নও তুমি ছবি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জ্যাঠামশায়

(১)

আমি পাড়াগাঁ হইতে কলিকাতায় আসিয়া কালেজে প্রবেশ করিলাম। শচীশ তখন বি এ ক্লাসে পড়িতেছে। আমাদের বয়স প্রায় সমান হইবে।

শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক—তার চোখ জ্বলিতেছে; তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রং যেন রং নহে, তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম;—তাই এক-মুহূর্ত্তে তাহাকে ভালোবাসিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে শচীশের সঙ্গে যারা পড়ে তাদের অনেকেরই তার উপরে একটা বিষম বিদ্বেষ। আসল কথা, যাহারা দশের মত, বিনাকারণে দশের সঙ্গে তাহাদের বিরোধ বাধে না। কিন্তু মানুষের ভিতরকার দীপ্যমান সত্যপুরুষটি স্থূলতা ভেদ করিয়া যখন দেখা দেয় তখন অকারণে কেহবা তাহাকে প্রাণপণে পূজা করে আবার অকারণে কেহবা তাহাকে প্রাণপণে অপমান করিয়া থাকে।

আমার মেসের ছেলেরা বুঝিয়াছিল আমি শচীশকে মনে মনে ভক্তি করি। এটাতে সর্ব্বদাই তাহাদের যেন আরামের ব্যাঘাত করিত। তাই আমাকে শুনাইয়া শচীশের সম্বন্ধে কটূকথা বলিতে তাহাদের একদিনও কামাই যাইত না। আমি জানিতাম

চোখে বালি পড়িলে রগড়াইতে গেলেই বাজে বেশি ;—কথাগুলো যেখানে কর্কশ সেখানে জবাব না করাই ভালো। কিন্তু একদিন শচীশের চরিত্রের উপর লক্ষ্য করিয়া এমন সব কুৎসা উঠিল আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমার মুস্কিল, আমি শচীশকে জানিতাম না। অপর পক্ষে কেহবা তার পাড়াপড়শি, কেহবা তার কোনো একটা সম্পর্কে কিছু-একটা। তারা খুব তেজের সঙ্গে বলিল, এ একেবারে খাঁটি সত্য ; আমি আরো তেজের সঙ্গে বলিলাম, আমি এর শিকি-পয়সা বিশ্বাস করি না।—তখন মেসসুদ্ধ সকলে আস্তিন গুটাইয়া বলিয়া উঠিল—তুমি ত ভারি অভদ্র লোক হে !

সে রাত্রে বিছানায় শুইয়া আমার কান্না আসিল। পরদিন ক্লাসের একটা ফাঁকে শচীশ যখন গোলদিঘির ছায়ায় ঘাসের উপর আধ-শোওয়া অবস্থায় একটা বই পড়িতেছে আমি বিনা-পরিচয়ে তার কাছে আবোল-তাবোল কি যে বকিলাম তার ঠিক নাই। শচীশ বই মুড়িয়া আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার চোখ যারা দেখে নাই তারা বুঝিবে না এই দৃষ্টি যে কি।

শচীশ বলিল, যারা নিন্দা করে তারা নিন্দা ভালোবাসে বলিয়াই করে, সত্য ভালোবাসে বলিয়া নয়। তাই যদি হইল তবে কোনো একটা নিন্দা যে সত্য নয় তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিয়া লাভ কি ?

আমি বলিলাম, তবু দেখুন্ মিথ্যাবাদীকে—

শচীশ বাধা দিয়া বলিল—ওরা ত মিথ্যাবাদী নয়। আমাদের পাড়ায় পক্ষাঘাতে একজন কলুর ছেলের গা-হাত কাঁপে, সে

কাজ করিতে পারে না। শীতের দিনে আমি তাকে একটা দামী কম্বল দিয়াছিলাম। সেইদিন আমার চাকর শিবু রাগে গরগর করিতে করিতে আসিয়া বলিল, বাবু, ও-বেটার কাঁপুনি টাঁপুনি সমস্ত বদমায়েসি।—আমার মধ্যে কিছু ভালো আছে এ কথা যারা উড়াইয়া দেয় তাদের সেই শিবুর দশা—তারা যা বলে তা সত্যই বিশ্বাস করে। আমার ভাগ্যে একটা কোনো দামী কম্বল অতিরিক্ত জুটিয়াছিল, রাজ্যসুদ্ধ শিবুর দল নিশ্চয় স্থির করিয়াছে সেটাতে আমার অধিকার নাই—আমি তা লইয়া তাদের সঙ্গে ঝগড়া করিতে লজ্জা বোধ করি।

ইহার কোনো উত্তর না দিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম, এরা যে বলে আপনি নাস্তিক, সে কি সত্য ?

শচীশ বলিল, হাঁ, আমি নাস্তিক।

আমার মাথা নীচু হইয়া গেল। আমি মেসের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছিলাম যে শচীশ কখনই নাস্তিক হইতে পারে না।

শচীশসম্বন্ধে গোড়াতেই আমি দুইটা মস্ত ঘা খাইয়াছি। আমি তাহাকে দেখিয়াই মনে করিয়াছিলাম সে ব্রাহ্মণের ছেলে। মুখখানি যে দেবমূর্ত্তির মত শাদা-পাথরে কোঁদা। তার উপাধি শুনিয়াছিলাম মল্লিক; আমাদেরও গাঁয়ে মল্লিক-উপাধিধারী এক-ঘর কুলীন ব্রাহ্মণ আছে। কিন্তু জানিয়াছি শচীশ সোনার বেনে। আমাদের নিষ্ঠাবান কায়স্থের ঘর—জাতিহিসাবে সোনার বেনেকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করিয়া থাকি। আর নাস্তিককে নর-ঘাতকের চেয়ে—এমন কি, গোখাদকের চেয়েও, পাপিষ্ঠ বলিয়া জানিতাম।

কোনো কথা না বলিয়া শচীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তখনো দেখিলাম মুখে সেই জ্যোতি—যেন অন্তরের মধ্যে পূজার প্রদীপ জ্বলিতেছে।

কেহ কোনোদিন মনে করিতে পারিত না আমি কোনোজন্মে সোনার বেনের সঙ্গে একসঙ্গে আহার করিব এবং নাস্তিক্যে আমার গোঁড়ামি আমার গুরুকে ছাড়াইয়া উঠিবে,—ক্রমে আমার ভাগ্যে তাও ঘটিল।

উইল্‌কিন্‌স্‌ আমাদের কালেজের সাহিত্যের অধ্যাপক। যেমন তাঁর পাণ্ডিত্য, ছাত্রদের প্রতি তেমনি তাঁর অবজ্ঞা। এদেশী কালেজে বাঙালী ছেলেকে সাহিত্য পড়ানো, শিক্ষকতার কুলি-মজুরি করা, ইহাই তাঁর ধারণা; এই জন্য মিলটন শেক্‌স্‌পীয়র পড়াইবার ক্লাসেও তিনি ইংরেজি বিড়াল শব্দের প্রতিশব্দ বলিয়া দিতেন মার্জ্জারজাতীয় চতুষ্পাদ, a quadruped of feline species। কিন্তু নোট লওয়া সম্বন্ধে শচীশের মাপ ছিল। তিনি বলিতেন, শচীশ, তোমাকে এই ক্লাসে বসিতে হয় সে লোকসান আমি পূরণ করিয়া দিব, তুমি আমার বাড়ী যাইয়ো, সেখানে তোমার মুখের স্বাদ ফিরাইতে পারিবে।

ছাত্রেরা রাগ করিয়া বলিত, শচীশকে সাহেব যে এত পছন্দ করে তার কারণ ওর গায়ের রং কটা আর ও সাহেবের মন ভোলাইবার জন্য নাস্তিকতা ফলাইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কোনো কোনো বুদ্ধিমান আড়ম্বর করিয়া সাহেবের কাছ হইতে পজিটিভিজ্‌ম সম্বন্ধে বই ধার চাহিতে গিয়াছিল—সাহেব বলিয়াছিলেন, তোমরা বুঝিবে না। তারা যে নাস্তিকতা-চর্চ্চারও

অযোগ্য এই কথায় নাস্তিকতা এবং শচীশের বিরুদ্ধে তাহাদের ক্ষোভ কেবল বাড়িয়া উঠিতেছিল।

(২)

মত এবং আচরণসম্বন্ধে শচীশের জীবনে নিন্দার কারণ যাহা যাহা আছে তাহা সংগ্রহ করিয়া আমি লিখিলাম। ইহার কিছু আমার সঙ্গে তার পরিচয়ের পূর্ব্বেকার অংশ, কিছু অংশ পরের।

জগমোহন শচীশের জ্যাঠা। তিনি তখনকার কালের নামজাদা নাস্তিক। তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতেন বলিলে কম বলা হয়—তিনি না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন। যুদ্ধ-জাহাজের কাপ্তেনের যেমন জাহাজ চালানোর চেয়ে জাহাজ-ডোবানই বড় ব্যবসা, তেমনি যেখানে সুবিধা সেইখানেই আস্তিক্যধর্ম্মকে ডুবাইয়া দেওয়াই জগমোহনের ধর্ম্ম ছিল। ঈশ্বর-বিশ্বাসীর সঙ্গে তিনি এই পদ্ধতিতে তর্ক করিতেন :—

ঈশ্বর যদি থাকেন তবে আমার বুদ্ধি তাঁরই দেওয়া ;—

সেই বুদ্ধি বলিতেছে যে, ঈশ্বর নাই ; —

অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন যে ঈশ্বর নাই ;

অথচ তোমরা তাঁর মুখের উপর জবাব দিয়া বলিতেছ যে ঈশ্বর আছেন। এই পাপের শাস্তিস্বরূপে তেত্রিশকোটি দেবতা তোমাদের দুই কান ধরিয়া জরিমানা আদায় করিতেছে।

বালক-বয়সে জগমোহনের বিবাহ হইয়াছিল। যৌবনকালে যখন তাঁর স্ত্রী মারা যান তার পূর্ব্বেই তিনি ম্যালথস্ পড়িয়াছিলেন ; আর বিবাহ করেন নাই।

তাঁর ছোট ভাই হরিমোহন ছিলেন শচীশের পিতা। তিনি তাঁর বড় ভাইয়ের এম্‌নি উল্টা প্রকৃতির যে সে কথা লিখিতে গেলে গল্প সাজানো বলিয়া লোকে সন্দেহ করিবে। কিন্তু গল্পই লোকের বিশ্বাস কাড়িবার জন্য সাবধান হইয়া চলে, সত্যের সে দায় নাই বলিয়া সত্য অদ্ভুত হইতে ভয় করে না। তাই সকাল এবং বিকাল যেমন বিপরীত, সংসারে বড় ভাই এবং ছোট ভাই তেমনি বিপরীত, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

হরিমোহন শিশুকালে অসুস্থ ছিলেন। তাগাতাবিজ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, সন্ন্যাসীর জটা-নিংড়ানো জল, বিশেষ বিশেষ পীঠস্থানের ধূলা, অনেক জাগ্রত ঠাকুরের প্রসাদ ও চরণামৃত, গুরুপুরোহিতের অনেক টাকার আশীর্ব্বাদে তাঁকে যেন সকল অকল্যাণ হইতে গড়বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল।

বড় বয়সে তাঁর আর ব্যামো ছিল না কিন্তু তিনি যে বড়ই কাহিল, সংসার হইতে এ সংস্কার ঘুচিল না। কোনোক্রমে তিনি বাঁচিয়া থাকুন, এর বেশি তাঁর কাছে কেহ কিছু দাবী করিত না। তিনিও এ সম্বন্ধে কাহাকেও নিরাশ করিলেন না, দিব্য বাঁচিয়া রহিলেন। কিন্তু শরীরটা যেন গেল-গেল এইভাব করিয়া সকলকে শাসাইয়া রাখিলেন। বিশেষত তাঁর পিতার অল্পবয়সে মৃত্যুর নজিরের জোরে মা-মাসির সমস্ত সেবা যত্ন তিনি নিজের দিকে টানিয়া লইলেন। সকলের আগে তাঁর আহার, সকলের হইতে তাঁর আহারের আয়োজন স্বতন্ত্র, সকলের চেয়ে তাঁর কাজ কম, সকলের চেয়ে তাঁর বিশ্রাম বেশি। কেবল মা মাসির নয়, তিনি যে তিন-ভুবনের সমস্ত ঠাকুর

দেবতার বিশেষ জিম্মায় এ তিনি কখনো ভুলিতেন না। কেবল ঠাকুরদেবতা নয়, সংসারে যেখানে যার কাছে যে পরিমাণে সুবিধা পাওয়া যায় তাকে তিনি সেই পরিমাণেই মানিয়া চলিতেন—থানার দারোগা, ধনী প্রতিবেশী, উচ্চপদের রাজপুরুষ, খবরের কাগজের সম্পাদক, সকলকেই যথোচিত ভয় ভক্তি করিতেন,—গো-ব্রাহ্মণের ত কথাই নাই।

জগমোহনের ভয় ছিল উল্টা দিকে। কারো কাছে তিনি লেশমাত্র সুবিধা প্রত্যাশা করেন এমন সন্দেহমাত্র পাছে কারো মনে আসে এই ভয়ে ক্ষমতাশালী লোকদিগকে তিনি দূরে রাখিয়া চলিতেন। তিনি যে দেবতা মানিতেন না তার মধ্যেও তাঁর ঐ ভাবটা ছিল। লৌকিক বা অলৌকিক কোনো শক্তির কাছে তিনি হাতজোড় করিতে নারাজ।

যথাকালে, অর্থাৎ যথাকালের অনেক পূর্ব্বে, হরিমোহনের বিবাহ হইয়া গেল। তিন মেয়ে, তিন ছেলের পরে শচীশের জন্ম। সকলেই বলিল জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে শচীশের চেহারার আশ্চর্য্য মিল। জগমোহনও তাকে এমনি করিয়া অধিকার করিয়া বসিলেন যেন সে তাঁরই ছেলে।

ইহাতে যেটুকু লাভ ছিল হরিমোহন প্রথমটা সেইটুকুর হিসাব খতাইয়া খুসি ছিলেন। কেননা জগমোহন নিজে শচীশের শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন। ইংরেজিভাষায় অসামান্য ওস্তাদ বলিয়া জগমোহনের খ্যাতি। কাহারো মতে তিনি বাংলার মেকলে, কাহারো মতে বাংলার জন্‌সন্। শামুকের খোলার মত তিনি যেন ইংরেজি বই দিয়া ঘেরা। নুড়ির রেখা ধরিয়া

পাহাড়ে-ঝরণার পথ যেমন চেনা যায় তেমনি বাড়ির মধ্যে কোন্ কোন্ অংশে তাঁর চলাফেরা তাহা মেজে হইতে কড়ি পর্য্যন্ত ইংরেজি বইয়ের বোঝা দেখিলেই বুঝা যাইত।

হরিমোহন তাঁর বড় ছেলে পুরন্দরকে স্নেহের রসে একেবারে গলাইয়া দিয়াছেন। সে যাহা চাহিত তাহাতে তিনি না করিতে পারিতেন না। তার জন্য সর্ব্বদাই তাঁর চোখে যেন জল ছলছল করিত—তাঁর মনে হইত কোনো কিছুতে বাধা দিলে সে যেন বাঁচিবে না। পড়াশুনা কিছু তার হইলই না—সকাল সকাল বিবাহ হইয়া গেল এবং সেই বিবাহের চতুঃসীমানার মধ্যে কেহই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। হরিমোহনের পুত্রবধূ ইহাতে উদ্যমের সহিত আপত্তি প্রকাশ করিত এবং হরিমোহন তাঁর পুত্রবধূর উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিতেন, ঘরে তার উৎপাতেই তাঁর ছেলেকে বাহিরে সান্ত্বনার পথ খুঁজিতে হইতেছে।

এই সকল কাণ্ড দেখিয়াই পিতৃস্নেহের বিষম বিপত্তি হইতে শচীশকে বাঁচাইবার জন্য জগমোহন তাহাকে নিজের কাছ হইতে একটুও ছাড়া দিলেন না। শচীশ দেখিতে দেখিতে অল্পবয়সেই ইংরেজি লেখায় পড়ায় পাকা হইয়া উঠিল। কিন্তু সেইখানেই ত থামিল না। তার মগজের মধ্যে মিল্ বেন্থামের অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া সে যেন নাস্তিকতার মশালের মত জ্বলিতে লাগিল।

জগমোহন শচীশের সঙ্গে এমন চালে চলিতেন যেন সে তাঁর সমবয়সী। গুরুজনকে ভক্তি করাটা তাঁর মতে একটা ঝুঁটা সংস্কার; ইহাতে মানুষের মনকে গোলামীতে পাকা করিয়া দেয়। বাড়ির

কোনো-এক নূতন জামাই তাঁকে শ্রীচরণেষু পাঠ দিয়া চিঠি লিখিয়াছিল। তাহাকে তিনি নিম্নলিখিত প্রণালীতে উপদেশ দিয়াছিলেন: মাইডিয়ার নরেন, চরণকে শ্রী বলিলে যে কি. বলা হয় তা আমিও জানিনা তুমিও জাননা অতএব ওটা বাজে কথা; তার পরে, আমাকে একেবারে বাদ দিয়া আমার চরণে তুমি কিছু নিবেদন করিয়াছ, তোমার জানা উচিত আমার চরণটা আমারই এক অংশ, যতক্ষণ ওটা আমার সঙ্গে লাগিয়া আছে ততক্ষণ উহাকে তফাৎ করিয়া দেখা উচিত না; তার পরে, ঐ অংশটা হাতও নয় কানও নয়, ওখানে কিছু নিবেদন করা পাগ্‌লামি; তার পরে শেষ কথা এই যে, আমার চরণসম্বন্ধে বহুবচন প্রয়োগ করিলে ভক্তিপ্রকাশ করা হইতে পারে কারণ কোনো কোনো চতুষ্পদ তোমাদের ভক্তিভাজন কিন্তু ইহাতে আমার প্রাণিতত্ত্ব ঘটিত পরিচয়সম্বন্ধে তোমার অজ্ঞতা সংশোধন করিয়া দেওয়া আমি উচিত মনে করি।

এমন সকল বিষয়ে শচীশের সঙ্গে জগমোহন আলোচনা করিতেন যাহা লোকে সচরাচর চাপা দিয়া থাকে। এই লইয়া কেহ আপত্তি করিলে তিনি বলিতেন, বোল্‌তার বাসা ভাঙিয়া দিলেই তবে বোল্‌তা তাড়ানো যায়, তেমনি এসব কথায় লজ্জা-করাটা ভাঙিয়া দিলেই লজ্জার কারণটাকে খেদানো হয়; শচীশের মন হইতে আমি লজ্জার বাসা ভাঙিয়া দিতেছি।

(৩)

লেখাপড়া-শেখা সারা হইল। এখন হরিমোহন শচীশকে তার জ্যাঠার হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন।

কিন্তু মাছ তখন টোপও গিলিয়াছে বঁড়শিও তাকে বিঁধিয়াছে ;—তাই একপক্ষের টান যতই বাড়িল অপর পক্ষের বাঁধনও ততই আঁটিল। ইহাতে হরিমোহন ছেলের চেয়ে দাদার উপরে বেশি রাগ করিতে লাগিলেন—দাদার সম্বন্ধে রং-বেরঙের নিন্দায় পাড়া ছাইয়া দিলেন।

শুধু যদি মতবিশ্বাসের কথা হইত হরিমোহন আপত্তি করিতেন না ; মুরগি খাইয়া লোকসমাজে সেটাকে পাঁঠা বলিয়া পরিচয় দিলেও তিনি সহ্য করিতেন ; কিন্তু ইঁহারা এতদূরে গিয়াছিলেন যে মিথ্যার সাহায্যেও ইঁহাদিগকে ত্রাণ করিবার উপায় ছিল না। যেটাতে সব চেয়ে বাধিল সেটা বলি :

জগমোহনের নাস্তিকধর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল লোকের ভালো করা ;—সেই ভালো-করার মধ্যে অন্য যে-কোনো রস থাক্ একটা প্রধান রস এই ছিল যে, নাস্তিকের পক্ষে লোকের ভালো-করার মধ্যে নিছক নিজের লোকসান ছাড়া আর কিছুই নাই—তাহাতে না আছে পুণ্য, না আছে পুরস্কার, না আছে কোনো দেবতা বা শাস্ত্রের বকশিষের বিজ্ঞাপন বা চোখরাঙানি। যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, "অধিকতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনে" আপনার গরজটা কি ?—তিনি বলিতেন, কোনো গরজই নাই, সেইটেই আমার সব চেয়ে বড় গরজ। তিনি শচীশকে বলিতেন, দেখ্ বাবা, আমরা নাস্তিক, সেই গুমরেই আমাদিগকে একেবারে নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল হইতে হইবে। আমরা কিছুকে মানিনা বলিয়াই আমাদের নিজেকে মানিবার জোর বেশি।

"অধিকতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনের" প্রধান চেলা

ছিল তাঁর শচীশ। পাড়ায় চামড়ার গোটাকয়েক বড় আড়ৎ। সেখানকার যত মুসলমান ব্যাপারী এবং চামারদের লইয়া জ্যাঠায় ভাইপোয় মিলিয়া এমনি ঘনিষ্ঠরকমের হিতানুষ্ঠানে লাগিয় গেলেন যে হরিমোহনের ফোঁটাতিলক আগুনের শিখার মত জ্বলিয়া তাঁর মগজের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটাইবার জো করিল। দাদার কাছে শাস্ত্র বা আচারের দোহাই পাড়িলে উল্টা ফল হইবে এইজন্য তাঁর কাছে তিনি পৈতৃক-সম্পত্তির অন্যায় অপব্যয়ের নালিশ তুলিলেন। দাদা বলিলেন, তুমি পেট-মোটা পুরুৎপাণ্ডার পিছনে যে টাকাটা খরচ করিয়াছ আমার খরচের মাত্রা আগে সেই পর্য্যন্ত উঠুক তার পরে তোমার সঙ্গে বোঝা-পড়া হইবে।

বাড়ির লোক একদিন দেখিল বাড়ির যে মহলে জগমোহন থাকেন সেই দিকে একটা বৃহৎ ভোজের আয়োজন হইতেছে। তার পাচক এবং পরিবেষকের দল সব মুসলমান। হরিমোহন রাগে অস্থির হইয়া শচীশকে ডাকিয়া বলিলেন, তুই নাকি যত তোর চামার বাবাদের ডাকিয়া এই বাড়িতে আজ খাওয়াইবি?

শচীশ কহিল, আমার সম্বল থাকিলে খাওয়াইতাম—কিন্তু আমার ত পয়সা নাই। জ্যাঠামশায়. উহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

পুরন্দর রাগিয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইতেছিল। সে বলিতে-ছিল, কেমন উহারা এ বাড়িতে আসিয়া খায় আমি দেখিব।

হরিমোহন দাদার কাছে আপত্তি জানাইলে জগমোহন কহিলেন, তোমার ঠাকুরের ভোগ তুমি রোজই দিতেছ আমি কথা কই না—আমার ঠাকুরের ভোগ আমি একদিন দিব ইহাতে বাধা দিয়ো না।

তোমার ঠাকুর ?

হাঁ আমার ঠাকুর।

তুমি কি ব্রাহ্ম হইয়াছ ?

ব্রাহ্মরা নিরাকার মানে তাহাকে চোখে দেখা যায় না। তোমরা সাকারকে মানো তাহাকে কানে শোনা যায় না। আমরা সজীবকে মানি তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়—তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।

তোমার এই চামার মুসলমান দেবতা ?

হাঁ, আমার এই চামার মুসলমান দেবতা: তাহাদের আশ্চর্য্য এই এক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে তাহাদের সামনে ভোগের সামগ্রী দিলে তাহারা অনায়াসে সেটা হাতে করিয়া তুলিয়া খাইয়া ফেলে। তোমার কোনো দেবতা তাহা পারে না। আমি সেই আশ্চর্য্য রহস্য দেখিতে ভালোবাসি তাই আমার ঠাকুরকে আমার ঘরে ডাকিয়াছি ;—দেবতাকে দেখিবার চোখ যদি তোমার অন্ধ না হইত তবে তুমি খুসি হইতে।

পুরন্দর তার জ্যাঠার কাছে গিয়া খুব চড়া-গলায় কড়া কড়া কথা বলিল এবং জানাইল আজ সে একটা বিষমকাণ্ড করিবে।

জগমোহন হাসিয়া কহিলেন, ওরে বাঁদর, আমার দেবতা যে কত বড় জাগ্রত দেবতা তাহা তাঁর গায়ে হাত দিতে গেলেই বুঝিবি, আমাকে কিছুই করিতে হইবে না।

পুরন্দর যতই বুক ফুলাইয়া বেড়াক সে তার বাবার চেয়েও ভীতু। যেখানে তার আবদার সেখানেই তার জোর। মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘাঁটাইতে সে সাহস করিল না। শচীশকে আসিয়া

গালি দিল। শচীশ তার আশ্চর্য্য দুই চক্ষু দাদার মুখের দিকে তুলিয়া চাহিয়া রহিল—একটি কথাও বলিল না। সেদিনকার ভোজ নির্ব্বিঘ্নে চুকিয়া গেল।

(৪)

এইবার হরিমোহন দাদার সঙ্গে কোমর-বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন। যাহা লইয়া ইহাদের সংসার চলে'সেটা দেবত্র সম্পত্তি। জগমোহন বিধর্ম্মী আচারভ্রষ্ট এবং সেই কারণে সেবায়েৎ হইবার অযোগ্য এই বলিয়া জেলাকোর্টে হরিমোহন নালিশ রুজু করিয়া দিলেন। মাতব্বর সাক্ষীর অভাব ছিল না,—পাড়াসুদ্ধ লোক সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত

অধিক কৌশল করিতে হইল না। জগমোহন আদালতে স্পষ্টই কবুল করিলেন তিনি দেবদেবী মানেন না; খাদ্য অখাদ্য বিচার করেন না, মুসলমান ব্রহ্মার কোন্‌খান হইতে জন্মিয়াছে তাহা তিনি জানেন না এবং তাহাদের সঙ্গে তাঁর খাওয়াদাওয়া চলার কোনো বাধা নাই।

মুন্সেফ জগমোহনকে সেবায়েৎ পদের অযোগ্য বলিয়া রায় দিলেন। জগমোহনের পক্ষের আইনজ্ঞরা আশা দিলেন এ রায় হাইকোর্টে টিঁকিবে না। জগমোহন বলিলেন, আমি আপিল করিব না। যে ঠাকুরকে মানি না তাহাকেও আমি ফাঁকি দিতে পারিব না। দেবতা মানিবার মত বুদ্ধি যাহাদের, দেবতাকে বঞ্চনা করিবার মত ধর্ম্মবুদ্ধিও তাহাদেরই।

বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিল, খাইবে কি?

তিনি বলিলেন, কিছু না খাবার জোটে ত খাবি খাইব।

এই মকদ্দমা জয় লইয়া আস্ফালন করা হরিমোহনের ইচ্ছা ছিল না। তাঁর ভয় ছিল পাছে দাদার অভিশাপের কোনো কুফল থাকে। কিন্তু পুরন্দর একদিন চামারদের বাড়ি হইতে তাড়াইতে পারে নাই সেই আগুন তার মনে জ্বলিতেছিল। কার দেবতা যে জাগ্রত এইবার সেটা ত প্রত্যক্ষ দেখা গেল। তাই পুরন্দর ভোর বেলা হইতে ঢাকঢোল আনাইয়া পাড়া মাথায় করিয়া তুলিল। জগমোহনের কাছে তাঁর এক বন্ধু আসিয়াছিল, সে কিছু জানিত না—সে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারখানা কি হে?—জগমোহন বলিলেন, আজ আমার ঠাকুরের ধুম করিয়া ভাসান হইতেছে তারি এই বাজনা।—দুই দিন ধরিয়া পুরন্দর নিজে উদ্যোগ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দিল। পুরন্দর যে এই বংশের কুলপ্রদীপ, সকলে তাহা ঘোষণা করিতে লাগিল।

দুই ভাইয়ে ভাগাভাগি হইয়া কলিকাতার ভদ্রাসনবাটির মাঝ-মাঝি প্রাচীর উঠিয়া গেল।

ধর্ম্মসম্বন্ধে যেমনি হউক্ খাওয়াপরা টাকাকড়িসম্বন্ধে মানুষের একটা স্বাভাবিক সুবুদ্ধি আছে বলিয়া মানবজাতির প্রতি হরিমোহনের একটা শ্রদ্ধা ছিল। তিনি নিশ্চয় ঠাওরাইয়াছিলেন তাঁর ছেলে এবার নিঃস্ব জগমোহনকে ছাড়িয়া অন্তত আহারের গন্ধে তাঁর সোনার খাঁচাকলের মধ্যে ধরা দিবে। কিন্তু বাপের ধর্ম্মবুদ্ধি ও কর্ম্মবুদ্ধি কোনোটাই পায় নাই শচীশ তার পরিচয় দিল। সে তার জ্যাঠার সঙ্গেই রহিয়া গেল।

জগমোহনের চিরকাল শচীশকে এমনি নিতান্তই আপনার বলিয়া জানা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে আজ এই ভাগাভাগির

দিনে শচীশ যে তাঁরই ভাগ্যে পড়িয়া গেল ইহাতে তাঁর কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হইল না।

কিন্তু হরিমোহন তাঁর দাদাকে বেশ চিনিতেন। তিনি লোকের কাছে রটাইতে লাগিলেন যে শচীশকে আটকাইয়া জগমোহন নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিবার কৌশল খেলিতেছেন। তিনি অত্যন্ত সাধু হইয়া প্রায় অশ্রুনেত্রে সকলকে বলিলেন, দাদাকে কি আমি খাওয়াপরার কষ্ট দিতে পারি? কিন্তু তিনি আমার ছেলেকে হাতে রাখিয়া এই যে সয়তানী চাল চালিতেছেন ইহা আমি কোনোমতেই সহিব না। দেখি তিনি কত বড় চালাক।

কথাটা বন্ধুপরম্পরায় জগমোহনের কানে যখন পৌঁছিল তখন তিনি একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। এমন কথা যে উঠিতে পারে তাহা তিনি ভাবেন নাই বলিয়া নিজেকে নির্ব্বোধ বলিয়া ধিক্কার দিলেন। শচীশকে বলিলেন, গুড্‌বাই শচীশ!

শচীশ বুঝিল, যে বেদনা হইতে জগমোহন এই বিদায়বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তার উপরে আর কথা চলিবে না। আজ আঠারো বৎসর আজন্মকালের নিরবচ্ছিন্ন সংস্রব হইতে শচীশকে বিদায় লইতে হইল।

শচীশ যখন তার বাক্স ও বিছানা গাড়ির মাথায় চাপাইয়া দিয়া তাঁর কাছ হইতে চলিয়া গেল জগমোহন দরজা বন্ধ করিয়া তাঁর ঘরের মধ্যে মেঝের উপর শুইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল—তাঁর পুরাতন চাকর ঘরে আলো দিবার জন্য দরজায় ঘা দিল, তিনি সাড়া দিলেন না।

হায় রে, অধিকতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধন! মানুষের

সম্বন্ধে বিজ্ঞানের পরিমাপ যে খাটে না। মাথা গণনায় যে মানুষটি কেবল এক, হৃদয়ের মধ্যে সে যে সকল গণনার অতীত। শচীশকে কি এক দুই তিনের কোঠায় ফেলা যায়? সে যে জগমোহনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সমস্ত জগৎকে অসীমতায় ছাইয়া ফেলিল।

শচীশ কেন গাড়ি আনাইয়া তার উপরে আপনার জিনিষপত্র তুলিল জগমোহন তাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসাও করিলেন না। বাড়ির যে বিভাগে তার বাপ থাকেন শচীশ সেদিকে গেল না, সে তার এক বন্ধুর মেসে গিয়া উঠিল। নিজের ছেলে যে কেমন করিয়া এমন পর হইয়া যাইতে পারে তাহা স্মরণ করিয়া হরিমোহন বারম্বার অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তাঁর হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল।

বাড়ি ভাগ হইয়া যাইবার পর পুরন্দর জেদ করিয়া তাহাদের অংশে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করাইল এবং সকালে সন্ধ্যায় শাঁখঘণ্টার আওয়াজে জগমোহনের কান ঝালাফালা হইয়া উঠিতেছে ইহাই কল্পনা করিত এবং সে লাফাইতে থাকিত।

শচীশ প্রাইভেট-টুইশনি লইল এবং জগমোহন একটা এণ্ট্রেন্স স্কুলের হেডমাষ্টারি জোগাড় করিলেন। হরিমোহন এবং পুরন্দর এই নাস্তিক শিক্ষকের হাত হইতে ভদ্রঘরের ছেলেদিগকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

(৫)

কিছুকাল পরে শচীশ একদিন দোতলায় জগমোহনের পড়িবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত। ইহাদের মধ্যে প্রণাম করিবার প্রথা

ছিল না। জগমোহন শচীশকে আলিঙ্গন করিয়া চৌকিতে বসাইলেন। বলিলেন, খবর কি ?

একটা বিশেষ খবর ছিল।

ননীবালা তার বিধবা মায়ের সঙ্গে তার মামার বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছিল। যতদিন তার মা বাঁচিয়া ছিল কোনো বিপদ ঘটে নাই। অল্পদিন হইল মা মরিয়াছে। মামাতো-ভাইগুলো দুশ্চরিত্র। তাহাদেরই এক বন্ধু ননীবালাকে তার আশ্রয় হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিছুদিন বাদে ননীর পরে তার সন্দেহ হইতে থাকে এবং সেই ঈর্ষায় তাহাকে অপমানের একশেষ করে। যে বাড়িতে শচীশ মাষ্টারী করে তারই পাশের বাড়িতে এই কাণ্ড। শচীশ এই হতভাগিনীকে উদ্ধার করিতে চায়। কিন্তু তার না আছে অর্থ, না আছে ঘর দুয়ার। তাই সে তার জ্যাঠার কাছে আসিয়াছে। এদিকে মেয়েটির সন্তান-সম্ভাবনা।

জগমোহন ত একেবারে আগুন। সেই পুরুষটাকে পাইলে এখনি তার মাথা গুঁড়া করিয়া দেন এমনি তাঁর ভাব। তিনি এ সব ব্যাপারে শান্ত হইয়া সকল দিক চিন্তা করিবার লোক নন্। একেবারে বলিয়া বসিলেন, তা বেশ ত, আমার লাইব্রেরি-ঘর খালি আছে সেইখানে আমি তাকে থাকিতে দিব।

শচীশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, লাইব্রেরি-ঘর ? কিন্তু বইগুলো ?

যতদিন কাজ জোটে নাই কিছু কিছু বই বিক্রি করিয়া জগমোহন দিন চালাইয়াছেন। এখন অল্প যা বই বাকি আছে তা শোবার ঘরেই ধরিবে।

জগমোহন বলিলেন, মেয়েটিকে এখনি লইয়া এসো।

শচীশ কহিল, তাকে আনিয়াছি, সে নীচের ঘরে বসিয়া আছে।

জগমোহন নামিয়া আসিয়া দেখিলেন, সিঁড়ির পাশের ঘরে একখানা কাপড়ের পুঁটুলির মত জড়সড় হইয়া মেয়েটি এককোণে মাটির উপরে বসিয়া আছে।

জগমোহন ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাঁর মেঘগম্ভীর গলায় বলিয়া উঠিলেন—এস আমার মা এস! ধূলায় কেন বসিয়া?

মেয়েটি মুখের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

জগমোহনের চোখে সহজে জল আসে না—তাঁর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। তিনি শচীশকে বলিলেন, শচীশ, এই মেয়েটি আজ যে লজ্জা বহন করিতেছে, সে যে আমার লজ্জা, তোমার লজ্জা। আহা, ওর উপরে এত বড় বোঝা কে চাপাইল?

মা, আমার কাছে তোমার লজ্জা খাটিবে না—আমাকে আমার ইস্কুলের ছেলেরা পাগ্‌লা জগাই বলিত—আজও আমি সেই পাগল আছি।—বলিয়া জগমোহন নিঃসঙ্কোচে মেয়েটির দুই হাত ধরিয়া মাটি হইতে তাকে দাঁড় করাইলেন—মাথা হইতে তার ঘোমটা খসিয়া পড়িল।

নিতান্ত কচিমুখ, অল্প বয়স, সে মুখে কলঙ্কের কোনো চিহ্ন পড়ে নাই। ফুলের উপরে ধূলা লাগিলেও যেমন তার আন্তরিক শুচিতা দূর হয় না তেমনি এই শিরীষফুলের মত মেয়েটির ভিতরকার পবিত্রতার লাবণ্য ত ঘোচে নাই। তার দুই কালো চোখের মধ্যে আহত হরিণীর মত ভয়, তার সমস্ত দেহ-লতাটির

মধ্যে লজ্জার সঙ্কোচ, কিন্তু এই সরল সকরুণতার মধ্যে কালিমা ত কোথাও নাই।

ননীবালাকে জগমোহন তাঁর উপরের ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, মা, এই দেখ আমার ঘরের শ্রী! সাতজন্মে ঝাঁট পড়ে না; সমস্ত উল্টাপাল্টা; আর আমার কথা যদি বল কখন্ নাই কখন্ খাই তার ঠিকানা নাই। তুমি আসিয়াছ এখন আমার ঘরের শ্রী ফিরিবে, আর পাগ্‌লা জগাইও মানুষের মত হইয়া উঠিবে।

মানুষ যে মানুষের কতখানি তা আজকের পূর্ব্বে ননীবালা অনুভব করে নাই—এমন কি, মা থাকিতেও না। কেন না, মা ত তাকে মেয়ে বলিয়া দেখিত না, বিধবা মেয়ে বলিয়া দেখিত—সেই সম্বন্ধের পথ যে আশঙ্কার ছোট ছোট কাঁটায় ভরা ছিল। কিন্তু জগমোহন সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়াও ননীবালাকে তার সমস্ত ভালোমন্দর আবরণ ভেদ করিয়া এমন পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিলেন কি করিয়া?

জগমোহন একটি বুড়ি ঝি রাখিয়া দিলেন এবং ননীবালাকে কোথাও কিছু সঙ্কোচ করিতে দিলেন না। ননীর বড় ভয় ছিল, জগমোহন তার হাতে খাইবেন কি না—সে যে পতিতা। কিন্তু এমনি ঘটিল জগমোহন তার হাতে ছাড়া খাইতেই চান না—সে নিজে রাঁধিয়া কাছে বসিয়া না খাওয়াইলে তিনি খাইবেন না এই তার পণ।

জগমোহন জানিতেন এইবার আর-একটা মস্ত নিন্দার পালা আসিতেছে। ননীও তাহা বুঝিত, এবং সেজন্য তার ভয়ের অন্ত ছিল না। দুচার দিনের মধ্যেই সুরু হইল। ঝি আগে মনে

করিয়াছিল ননী জগমোহনের মেয়ে—সে একদিন আসিয়া ননীকে কি সব বলিল এবং ঘৃণা করিয়া চাকরী ছাড়িয়া দিয়া গেল। জগমোহনের কথা ভাবিয়া ননীর মুখ শুকাইয়া গেল। জগমোহন কহিলেন, মা, আমার ঘরে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, তাই নিন্দায় কোটালের বান ডাকিবার সময় আসিল—কিন্তু ঢেউ যতই ঘোলা হউক আমার জ্যোৎস্নায় ত দাগ লাগিবে না।

জগমোহনের এক পিসি হরিমোহনের মহল হইতে আসিয়া কহিলেন, ছি ছি এ কি কাণ্ড জগাই? পাপ বিদায় করিয়া দে!

জগমোহন কহিলেন, তোমরা ধার্ম্মিক তোমরা এমন কথা বলিতে পার কিন্তু পাপ যদি বিদায় করি তবে এই পাপিষ্ঠের গতি কি হইবে?

কোনো-এক সম্পর্কের দিদিমা আসিয়া বলিলেন, মেয়েটাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দে, হরিমোহন সমস্ত খরচ দিতে রাজি আছে।

জগমোহন কহিলেন, মা যে;—টাকার সুবিধা হইয়াছে বলিয়াই খামকা মাকে হাঁসপাতালে পাঠাইব হরিমোহনের এ কেমন কথা?

দিদিমা গালে হাত দিয়া কহিলেন, মা বলিস্ কাকে রে?

জগমোহন কহিলেন, জীবকে যিনি গর্ভে ধারণ করেন তাঁকে। যিনি প্রাণসংশয় করিয়া ছেলেকে জন্ম দেন তাঁকে। সেই ছেলের পাষণ্ড বাপকে ত আমি বাপ বলি না। সে বেটা কেবল বিপদ বাধায়, তার ত কোনো বিপদই নাই।

হরিমোহনের সর্ব্বশরীর ঘৃণায় যেন ক্লেদসিক্ত হইয়া গেল। গৃহস্থের ঘরের দেয়ালের ওপাশেই বাপপিতামহের ভিটায় একটা ভ্রষ্টা মেয়ে এমন করিয়া বাস করিবে ইহা সহ্য করা যায় কি করিয়া?

এই পাপের মধ্যে শচীশ ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত আছে এবং তার নাস্তিক জ্যাঠা ইহাতে তাকে প্রশ্রয় দিতেছে একথা বিশ্বাস করিতে হরিমোহনের কিছুমাত্র বিলম্ব বা দ্বিধা হইল না। বিষম উত্তেজনার সঙ্গে সেকথা তিনি সর্ব্বত্র রটাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এই অন্যায় নিন্দা কিছুমাত্র কমে সে জন্য জগমোহন কোনো চেষ্টাই করিলেন না। তিনি বলিলেন, আমাদের নাস্তিকের ধর্ম্মশাস্ত্রে ভালোকাজের জন্য নিন্দার নরকভোগ বিধান।—জনশ্রুতি যতই নূতন নূতন রঙে নূতন নূতন রূপ ধরিতে লাগিল শচীশকে লইয়া ততই তিনি উচ্চহাস্যে আনন্দসম্ভোগ করিতে লাগিলেন। এমন কুৎসিত ব্যাপার লইয়া নিজের ভাইপোর সঙ্গে এমন কাণ্ড করা হরিমোহন বা তাঁর মত অন্য কোনো ভদ্রশ্রেণীর লোক কোনোদিন শোনেন নাই।

জগমোহন বাড়ির যে অংশে থাকেন, ভাগ হওয়ার পর হইতে পুরন্দর তার ছায়া মাড়ায় নাই। সে প্রতিজ্ঞা করিল মেয়েটাকে পাড়া হইতে তাড়াইবে তবে অন্য কথা।

জগমোহন যখন ইস্কুলে যাইতেন তখন তাঁর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিবার সকল রাস্তাই বেশ ভালো করিয়া বন্ধসন্ধ করিয়া যাইতেন এবং যখন একটুমাত্র ছুটির সুবিধা পাইতেন একবার করিয়া দেখিয়া যাইতে ছাড়িতেন না।

একদিন দুপুরবেলায় পুরন্দর নিজেদের দিকের ছাদের পাঁচিলের উপরে মই লাগাইয়া জগমোহনের অংশে লাফ দিয়া পড়িল। তখন আহারের পর ননীবালা তার ঘরে শুইয়া ঘুমাইতেছিল—দরজা খোলাই ছিল।

পুরন্দর ঘরে ঢুকিয়া নিদ্রিত ননীকে দেখিয়া বিস্ময়ে এবং রাগে গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—তাই বটে! তুই এখানে!

জাগিয়া উঠিয়া পুরন্দরকে দেখিয়া ননীর মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল। সে পলাইবে কিম্বা একটা কথা বলিবে এমন শক্তি তার রহিল না। পুরন্দর রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ডাকিল—ননী!

এমন সময়ে জগমোহন পশ্চাৎ হইতে ঘরে প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন—বেরো আমার ঘর থেকে বেরো!

পুরন্দর ক্রুদ্ধ বিড়ালের মত ফুলিতে লাগিল। জগমোহন কহিলেন, যদি না যাও আমি পুলিস ডাকিব।

পুরন্দর একবার ননীর দিকে অগ্নিকটাক্ষ ফেলিয়া চলিয়া গেল। ননী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

জগমোহন বুঝিলেন ব্যাপারটা কি। তিনি শচীশকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিয়া বুঝিলেন শচীশ জানিত পুরন্দরই ননীকে নষ্ট করিয়াছে; পাছে তিনি রাগ করিয়া গোলমাল করেন এই জন্য তাঁকে কিছু বলে নাই। শচীশ মনে জানিত কলিকাতা সহরে আর-কোথাও পুরন্দরের উৎপাত হইতে ননীর নিস্তার নাই একমাত্র জ্যাঠার বাড়িতে সে কখনো পারৎপক্ষে পদার্পণ করিবে না।

ননী একটা ভয়ের হাওয়ায় কয়দিন যেন বাঁশপাতার মত কাঁপিতে লাগিল। তার পরে একটি মৃত সন্তান প্রসব করিল।

পুরন্দর একদিন লাথি মারিয়া ননীকে অর্দ্ধরাত্রে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। তার পরে অনেক খোঁজ করিয়া তাহাকে পায় নাই। এমন সময়ে জ্যাঠার বাড়িতে তাহাকে দেখিয়া ঈর্ষার

আগুনে তার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিতে লাগিল। তার মনে হইল একে ত শচীশ নিজের ভোগের জন্য ননীকে তার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়াছে তার পরে পুরন্দরকেই বিশেষভাবে অপমান করিবার জন্য তাহাকে একেবারে তার বাড়ির পাশেই রাখিয়াছে। এ ত কোনোমতেই সহ্য করিবার নয়।

কথাটা হরিমোহন জানিতে পারিলেন। ইহা হরিমোহনকে জানিতে দিতে পুরন্দরের কিছুমাত্র লজ্জা ছিল না। পুরন্দরের এই সমস্ত দুষ্কৃতির প্রতি তাঁর একপ্রকার স্নেহই ছিল।

শচীশ যে নিজের দাদা পুরন্দরের হাত হইতে এই মেয়েটাকে ছিনাইয়া লইবে ইহা তাঁর কাছে বড়ই অশাস্ত্রীয় এবং অস্বাভাবিক বোধ হইল। পুরন্দর এই অসহ্য অপমান ও অন্যায় হইতে আপন প্রাপ্য উদ্ধার করিয়া লইবে এই তাঁর একান্ত মনের সংকল্প হইয়া উঠিল। তখন তিনি নিজে টাকা সাহায্য করিয়া ননীর একটা মিথ্যা মা খাড়া করিয়া জগমোহনের কাছে নাকী-কান্না কাঁদিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। জগমোহন তাকে এমন ভীষণমূর্ত্তি ধরিয়া তাড়া করিলেন যে সে আর সেদিকে ঘেঁষিল না।

ননী দিনে দিনে ম্লান হইয়া যেন ছায়ার মত হইয়া মিলাইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। তখন ক্রিষ্টমাসের ছুটি। জগমোহন একমুহূর্ত্ত ননীকে ছাড়িয়া বাহিরে যান না।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে তিনি তাকে স্কটের একটা গল্প বাংলা করিয়া পড়িয়া শুনাইতেছেন এমন সময়ে ঘরের মধ্যে পুরন্দর আর-একজন যুবককে লইয়া ঝড়ের মত প্রবেশ করিল। তিনি যখন পুলিস ডাকিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে সেই

যুবকটি বলিল, আমি ননীর ভাই, আমি উহাকে লইতে আসিয়াছি।

জগমোহন তার কোনো উত্তর না করিয়া পুরন্দরকে ঘাড়ে ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে সিঁড়ির কাছ পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া এক ধাক্কায় নীচের দিকে রওনা করিয়া দিলেন। অন্য যুবকটিকে বলিলেন, পাষণ্ড লজ্জা নাই তোমার? ননীকে রক্ষা করিবার বেলা তুমি কেহ নও আর সর্ব্বনাশ করিবার বেলা তুমি ননীর ভাই?

সে লোকটি প্রস্থান করিতে বিলম্ব করিল না কিন্তু দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল, পুলিসের সাহায্যে সে তার বোনকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবে। এ লোকটা সত্যই ননীর মামাতো ভাই বটে। শচীশই যে ননীর পতনের কারণ সেই কথা প্রমাণ করিবার জন্য পুরন্দর তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিল।

ননী মনে মনে বলিতে লাগিল, ধরণী দ্বিধা হও।

জগমোহন শচীশকে ডাকিয়া বলিলেন, ননীকে লইয়া আমি পশ্চিমে কোনো-একটা সহরে চলিয়া যাই—সেখানে যা-হয় একটা জুটাইয়া লইব—যেরূপ উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে এখানে থাকিলে ও-মেয়েটা আর বাঁচিবে না।

শচীশ কহিল, দাদা যখন লাগিয়াছেন তখন যেখানে যাও উৎপাত সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।

তবে উপায়?

উপায় আছে। আমি ননীকে বিবাহ করিব।

বিবাহ করিবে?

হাঁ, সিভিল বিবাহের আইনমতে।

জগমোহন শচীশকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁর চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এমন অশ্রুপাত তাঁর বয়সে আর-কখনো তিনি করেন নাই।

(৬)

বাড়ি-বিভাগের পর হরিমোহন একদিনও জগমোহনকে দেখিতে আসেন নাই। সেদিন উস্কোখুস্কো আলুথালু হইয়া আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন, দাদা, এ কি সর্ব্বনাশের কথা শুনিতেছি?

জগমোহন কহিলেন, সর্ব্বনাশের কথাই ছিল, এখন তাহা হইতে রক্ষার উপায় হইতেছে।

দাদা, শচীশ তোমার ছেলের মত—তার সঙ্গে ঐ পতিতা মেয়ের তুমি বিবাহ দিবে?

শচীশকে আমি ছেলের মত করিয়াই মানুষ করিয়াছি—আজ তা আমার সার্থক হইল, সে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে।

দাদা, আমি তোমার কাছে হার মানিতেছি—আমার আয়ের অর্দ্ধ অংশ আমি তোমার নামে লিখিয়া দিতেছি—আমার উপরে এমন ভয়ানক করিয়া শোধ তুলিয়ো না।

জগমোহন চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, বটে! তুমি তোমার এঁটো-পাতের অর্দ্ধেক আমাকে দিয়া কুকুর ভুলাইতে আসিয়াছ! আমি তোমার মত ধার্ম্মিক নই, আমি নাস্তিক, সে কথা মনে রাখিয়ো—আমি রাগের শোধও লই না, অনুগ্রহের ভিক্ষাও লই না।

হরিমোহন শচীশের মেসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া কহিলেন—এ কি শুনি? তোর কি

মরিবার আর জায়গা জুটিল না? এমন করিয়া কুলে কলঙ্ক দিতে বসিলি?

শচীশ বলিল, কুলের কলঙ্ক মুছিবার জন্যই আমার এই চেষ্টা, নহিলে বিবাহ করিবার সখ আমার নাই।

হরিমোহন কহিলেন, তোর কি ধর্ম্মজ্ঞান একটুও নাই? ঐ মেয়েটা তোর দাদার স্ত্রীর মত, উহাকে তুই—

শচীশ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—স্ত্রীর মত? এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিবেন না।

ইহার পরে হরিমোহন যা মুখে আসিল তাই বলিয়া শচীশকে গাল-পাড়িতে লাগিলেন। শচীশ কোনো উত্তর করিল না।

হরিমোহনের বিপদ ঘটিয়াছে এই যে, পুরন্দর নির্লজ্জের মত বলিয়া বেড়াইতেছে যে শচীশ যদি ননীকে বিবাহ করে তবে সে আত্মহত্যা করিয়া মরিবে। পুরন্দরের স্ত্রী বলিতেছে, তাহা হইলে ত আপদ চোকে কিন্তু সে তোমার ক্ষমতায় কুলাইবে না। হরিমোহন পুরন্দরের এই শাসানি সম্পূর্ণ যে বিশ্বাস করে তা নয় অথচ তার ভয়ও যায় না।

শচীশ এতদিন ননীকে এড়াইয়া চলিত—একলা ত একদিনও দেখা হয় নাই, তার সঙ্গে দুটা কথা হইয়াছে কিনা সন্দেহ। বিবাহের কথা যখন পাকাপাকি ঠিক হইয়া গেছে তখন জগমোহন শচীশকে বলিলেন, বিবাহের পূর্ব্বে নিরালায় একদিন ননীর সঙ্গে ভালো করিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া লও, একবার দুজনের মন-জানাজানি হওয়া দরকার।

শচীশ রাজি হইল।

জগমোহন দিন ঠিক করিয়া দিলেন। ননীকে বলিলেন, মা, আমার মনের মত করিয়া আজ কিন্তু তোমাকে সাজিতে হইবে।

ননী লজ্জায় মুখ নীচু করিল।

না, মা, লজ্জা করিলে চলিবে না—আমার বড় মনের সাধ আজ তোমার সাজ দেখিব—এ তোমাকে পূরাইতে হইবে।

এই বলিয়া চুম্‌কি-দেওয়া বেনারসি সাড়ি, জামা ও ওড়না, যা তিনি নিজে পছন্দ করিয়া কিনিয়া আনিয়াছিলেন, ননীর হাতে দিলেন।

ননী গড় হইয়া পায়ের ধূলা লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া পা সরাইয়া লইয়া কহিলেন—এতদিনে তবু তোমার ভক্তি ঘোচাইতে পারিলাম না। আমি না হয় বয়সেই বড় হইলাম, কিন্তু মা, তুমি যে মা বলিয়া আমার বড়।—এই বলিয়া তার মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন—ভবতোষের বাড়ি আমার নিমন্ত্রণ আছে ফিরিতে কিছু রাত হইবে।

ননী তাঁর হাত ধরিয়া বলিল, বাবা, তুমি আজ আমাকে আশীর্ব্বাদ কর।

মা, আমি স্পষ্টই দেখিতেছি, বুড়োবয়সে তুমি এই নাস্তিককে আস্তিক করিয়া তুলিবে। আমি আশীর্ব্বাদে শিকি-পয়সা বিশ্বাস করি না কিন্তু তোমার ঐ মুখখানি দেখিলে আমার আশীর্ব্বাদ করিতে ইচ্ছা করে।

বলিয়া চিবুক ধরিয়া ননীর মুখটি তুলিয়া কিছুক্ষণ নীরবে তার দিকে চাহিয়া রহিলেন—ননীর দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় ভবতোষের বাড়ি লোক ছুটিয়া গিয়া জগমোহনকে ডাকিয়া আনিল। তিনি আসিয়া দেখিলেন, বিছানার উপর ননীর দেহ পড়িয়া আছে,—তিনি যে কাপড়গুলি দিয়াছিলেন, সেইগুলি পরা—হাতে একখানি চিঠি। শিয়রের কাছে শচীশ দাঁড়াইয়া। জগমোহন চিঠি খুলিয়া পড়িয়া দেখিলেন—

বাবা, পারিলাম না, আমাকে মাপ কর। তোমার কথা ভাবিয়া এতদিন আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু তাঁকে যে আজও ভুলিতে পারি নাই। তোমার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম। পাপিষ্ঠা ননীবালা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তাজমহল

এ কথা জানিতে তুমি, ভারতঈশ্বর সা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।
শুধু তব অন্তর বেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক্ সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্র-সুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক্ লীন
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক্ আকাশ
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক্,
শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

হায় ওরে মানব-হৃদয়
বারবার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই !
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে ;—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে।
দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবী-মঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায়-গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময় যে নাই ;
আবার শিশিররাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোলো নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।
হায় রে হৃদয়
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।

নাই নাই, নাই যে সময় !
হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ ,
সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কি মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে ?
রহে না যে
বিলাপের অবকাশ
বারো মাস,
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌন জাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে।
জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।
প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।

হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে'
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্য্যদূত যুগযুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্ত্তা নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

চলে গেছ তুমি আজ,
মহারাজ ;
বাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে,
সিংহাসন গেছে টুটে ;

তব সৈন্যদল
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে,
উড়ে যায় দিল্লির পথের ধূলিপরে।
বন্দীরা গাহেনা গান ;
যমুনা-কল্লোলসাথে নহবৎ মিলায়না তান ;
তব পুরসুন্দরীর নূপুর-নিক্কণ
ভগ্নপ্রাসাদের কোণে
মরে' গিয়ে ঝিল্লিস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।
তবুও তোমার দূত অমলিন,
শ্রান্তিক্লান্তিহীন,
তুচ্ছ করি রাজ্য ভাঙা-গড়া,
তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠা-পড়া,
যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

মিথ্যা কথা,—কে বলে যে ভোলো নাই ?
কে বলে রে খোলো নাই
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার ?
অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার

আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া ?
বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
আজিও সে হয়নি বাহির ?
সমাধিমন্দির
একঠাঁই রহে চিরস্থির ;
ধরার ধূলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।
মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে ;
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে,—
তাই এ ধরারে
জীবনউৎসব শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মত যাও ফেলে।
তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ

পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্ত্তিরে তোমার
বারম্বার।
তাই
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।
যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধূলার মত জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে,
দিয়েছ তা' ধূলিরে ফিরায়ে।
সেই তব পশ্চাতের পথধূলি পরে
তব চিত্ত হতে বায়ুভরে
কখন্ সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা।
তুমি চলে গেছ দূরে
সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
উঠেছে অম্বরপানে,
কহিছে গম্ভীর গানে—
যত দূর চাই
নাই নাই সে পথিক নাই!
প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্রপর্ব্বত।
আজি তার রথ

চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার পানে।
তাই
স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।

১৫ই কার্ত্তিক ১৩২১ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এলাহাবাদ

ফরাসী গীতাঞ্জলির ভূমিকা

(ফরাসী হইতে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী কর্ত্তৃক অনূদিত)

প্রাচীন ভারতবর্ষের স্তূপাকার প্রকাণ্ড গ্রন্থাবলীর পরিচয় লইবার সুযোগ আমার ঘটে নাই। সময়ের অভাবে না হউক, —এ বিষয়ে রুচির অভাববশতঃ সে পরিচয় লাভ করা আমার ভাগ্যে কখন ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। Paul de Saint Victor উক্ত সাহিত্যসম্বন্ধে রসিকতাচ্ছলে এই কথা বলিয়াছেন যে,—"অনিয়মই তাহার নিয়ম।" তাঁহার মতে "য়ুরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় মনোভাবের মধ্যে শতকোটি ভীষণ দেবতার ব্যবধান।"

গীতাঞ্জলি আয়তনে ক্ষুদ্র, ইহাই আমার মতে তাহার একটি প্রধান গুণ। আর-একটি গুণ এই যে, এই পুস্তক কোনপ্রকার পুরাণপ্রসঙ্গে ভারাক্রান্ত নহে। আর-একটি গুণ এই যে, এ কবিতা পড়িবার জন্য কোনপ্রকার পাণ্ডিত্যের আবশ্যকতা নাই। অবশ্য প্রাচীন ভারতবর্ষের চিন্তার ধারার সহিত ইহার কোন্ সূত্রে যোগ, সেটি নির্ণয় করার লোভ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের মনের সহিত তাহার সম্পর্ক কি, সে আলোচনার মূল্য অনেক বেশী।

প্রশংসাভিন্ন কিছু হাতে রাখিব না এই ভাবিয়া, বইখানির যেটি মস্ত দোষ সেটি প্রথমেই নির্দ্দেশ করিতেছি; যতই ছোট হউক, উহার গঠন ভাল নহে। এ রচনাতে যে আমাদের পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিধিবদ্ধ ছন্দ মাত্রা ও যতির নিয়মভঙ্গ ঘটিয়াছে, অবশ্য

এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু গ্রন্থশেষে একটি ক্ষুদ্র টীকাই আমাদের সতর্ক করিয়া দিতেছে যে, গীতাঞ্জলি খণ্ড খণ্ড কবিতা ও গানের সমষ্টি, এবং সে খণ্ডগুলি পরস্পরসম্বদ্ধ নহে। ইহার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন কবিতা প্রথমতঃ বাঙ্গলায় তিনটি স্বতন্ত্র পুস্তকে প্রকাশিত হয়,—নৈবেদ্য, খেয়া ও গীতাঞ্জলি; শেষোক্তের নামে এই মালার নামকরণ করা হইয়াছে। মাসিকপত্রাদিতে এখানে ওখানে সময়ে সময়ে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে এমন অন্যান্য কবিতাও ইহাতে আছে। সেগুলি যেন যদৃচ্ছারোপিত। অপরাপর শ্রেণীবদ্ধ কবিতার মধ্যে এই সকল ইতস্ততঃপ্রক্ষিপ্ত কাব্যখণ্ড ভাবের ধারাবাহিকতায় বাধা দেয়, এবং চিত্তকে হেলায় উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে।

অতএব গীতাঞ্জলির বৈষম্য ঘোষণা করিবার নিমিত্ত এই পাদ-টীকাটির আবশ্যক ছিল না; উহা যে এক-নজরেই চোখে পড়ে শুধু তাহাই নহে, যেন চোখে আঙ্গুল দেয়। প্রথমে হয় ত ইহাতে মনে আঘাত লাগে, কিন্তু ক্রমে যেন কিঞ্চিৎ আমোদও বোধ হয়। সত্য বলিতে কি, কবি এ গ্রন্থে একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় ধরা পড়িয়াছেন বলিয়া আমার বড় ভাল লাগে। গঙ্গাতীরে যিনি এমন খ্যাতনামা কবি, তিনি চুয়ান্ন বৎসর বয়সে, কতকগুলি বন্ধুর অনুরোধে নিজের কবিতার ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন,—অথচ একযোগে একটি পুস্তক পূর্ণ করিতে পারেন এমন সঞ্চয় তাঁহার নাই।

ইহা কি কম কৌতুকের বিষয় যে, ইংরাজ সম্পাদক যে ছোট পেয়ালাটি অগ্রসর করিয়া ধরিলেন, তাহা ভরিয়া তুলিতে

এবার অন্ততঃ বিশাল ভারতবর্ষের ভাবের বিপুল স্রোতকে তিনবার, চারিবার, এমন কি পাঁচবার চেষ্টা করিতে হইয়াছে!

মহাভারতের ২১৪,৭৭৮ শ্লোক, এবং রামায়ণের ৪৮০০০ শ্লোকের পর গীতাঞ্জলি,—আঃ, কি আরাম! হায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌলতে ভারতবর্ষকে অবশেষে স্বল্পতাদোষে দোষী হইতে হইল,—সে জন্য আমি তাঁহার নিকট কত না কৃতজ্ঞ! এই যে দৈর্ঘ্যের বদলে মহার্ঘতা, ভারের বদলে সার,—এ পরিবর্ত্তনে আমাদের কত না লাভ! কারণ গীতাঞ্জলির ১০৩টি ক্ষুদ্র কবিতার প্রায় প্রত্যেকটিই যথেষ্ট সারগর্ভ।

আমি আবার কবিতাগুলির খাপছাড়া-ভাবের উল্লেখ করিব। প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি অতি সন্তর্পণে বাদ দিয়া এই বিসদৃশ ভাবটি ক্রমশঃ কমাইয়া আনিয়া যত শীঘ্র পারি বইখানির প্রাণস্পর্শী মর্ম্মটুকুসম্বন্ধে অলোচনা করাই আমার মনোগত অভিপ্রায়। সেই জন্য আমি প্রথমে ঠাকুরমহাশয়ের অন্যান্য রচনা সম্বন্ধে কিছু বলিব।

গীতাঞ্জলির আবির্ভাবের পরে আর-দুইখানি কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি,—The Crescent Moon,—শিশুপাঠ্য বা শিশুসম্বন্ধীয় কবিতাসংগ্রহ। তাহাতে আমরা গীতাঞ্জলির তিনটি কবিতার আবার দেখা পাই। সেগুলি যে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর তাহা নয়, কিন্তু সম্প্রতি সেগুলি নানাস্থলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে (LX, LXI ও LXII)।

"জগৎপারাবারের তীরে"

"খোকার চোখে যে ঘুম আসে"

"রঙিন খেলনা দিলে ওরাঙা হাতে"—শিশু।

The Gardener-নামক আর-একটি গ্রন্থ গত নবেম্বর মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পদ্যমালাটি ঠিক যৌবনকালে না হউক, অন্ততঃ গীতাঞ্জলির বহু পূর্ব্বে রচিত, এ কথা ভূমিকায় লেখা আছে। এই পুস্তকের অন্তর্গত কবিতাগুলির তারতম্য বিস্তর; কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কবিতার মধ্যে গুটিকতক প্রণয়-কবিতা জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে; গীতাঞ্জলির শ্রেষ্ঠ কবিতার যে ভগবৎ-প্রেম, ইহা সে প্রেম নহে; ইহা মানবীয় প্রেম, এমন কি ইন্দ্রিয়জ প্রেমও বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার মধ্যেও এমন একটি অতীন্দ্রিয় ভাব আছে, যে, এই শ্রেণীর একটি কবিতা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না:

"কাছে যাই ধরি হাত বুকে লই টানি"—
হৃদয়ের ধন—মানসী।

এই গ্রন্থের অপর-অনেক কবিতা সম্পূর্ণ আর-এক ধরণের। সেগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, এবং তাহাতে ভাবকে সোজাসুজি প্রকাশ না করিয়া যেন একটু তফাতে সরাইয়া একটি মঞ্চে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই রঙ্গমঞ্চে সেটি অভিনীত হয়, এবং একটি হাল্কা নীতিসূত্রে গাঁথিয়া কখন কখন কথোপকথনচ্ছলেও সেটি ব্যাখ্যা করা হয়। গীতাঞ্জলির কতকগুলি নিরেস কবিতাও এই ছাঁচে ঢালা। এই প্রণালীটি যে আমার বিশেষ মনঃপূত তাহা বলিতে পারি না। জ্ঞানের কথা বা ভাবের কথাকে এইপ্রকার অকিঞ্চিৎকর নীতিকথার রেজ্‌কিতে পরিণত করা সকল সময়ে সুফলপ্রদ নহে। ইহার কোন কোনটি দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের বড়পাদ্রী Schmidt সাহেবের ছোট গল্প স্মরণ করাইয়া দেয়। এই জাতীয় কবিতার

দৃষ্টান্তস্বরূপ LI. ও XXXI-সংখ্যার উল্লেখ করা যাইতে পারে। আর-একটি গূঢ় কবিতায় যোদ্ধা বর্ম্ম ও তীরের কথা আছে, সেটিও এস্থলে মোটেই মানানসই হয় নাই,—এবং কেবলমাত্র কলেবরবৃদ্ধি ছাড়া আর কি উদ্দেশ্যে এই সংগ্রহে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা বোঝা কঠিন। এটি একেবারে স্থানচ্যুত হইলে আমি ত কোন্ আপত্তির কারণ দেখি না। অপরপক্ষে নিম্নলিখিত নীতিকথাদ্বয় আমি সহজে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি।

(LXXVIII. ও L.)

"বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন সৃষ্টি করার কাজে"

"হারাধন"—খেয়া।

এই কবিতাটির বহুদেব-বাদ গীতাঞ্জলিতে অশ্রুতপূর্ব্ব, এবং সহসা মনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়। কিন্তু ইহা বস্তুতঃ বহুদেব-বাদ নহে, আপাতদৃষ্টে সেরূপ মনে হয় মাত্র। যে ঋগ্বেদ প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রাচীনতম পুঁথি, এবং যাহার ভাষা তখনো সংস্কৃত নামে অভিহিত হয় নাই, সেই ঋগ্বেদের এই সুন্দর শ্লোকটি যাঁহাদের মনে আছে, তাঁহারা ইহাতে আশ্চর্য্য হইবেন না :—

"এ সকল কথা কে জানে? কে-ই বা আমাদের কাছে বলিতে পারে? জীবগণ কোথা হইতে আসে? এই সৃষ্টি কি? দেবগণও তাহা হইতে উৎপন্ন; কিন্তু তিনি,—কে জানে তাঁহার অস্তিত্ব কিরূপ?"

দ্বিতীয় কবিতাটি এই :—

"ভিক্ষা করে ফিরতেছিলাম গ্রামের পথে পথে"—

"কৃপণ"—খেয়া।

এই কবিতাটি আর-একদিকে অপর-একটি দীর্ঘ শ্রেণীর অন্তর্ভূত। এ সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করিব। এ কবিতাগুলি গীতাঞ্জলি হইতে অনায়াসে পৃথক করিয়া লওয়া যায়,—যে হিসাবে Heineর "Buch der lieder" হইতে "Heimkehr"মালা অথবা "Lyrisches Intermezzo" পৃথক করা সহজ। Mussetর কবিতার একটি পুরাতন নামে উক্ত কবিতাবলীর নামকরণ করিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়—"ভগবানে ভরসা"; অথবা "ঈশ্বরের প্রতীক্ষা" বলিলে আরও ভাল হয়।

ভাবে মনে হয় ঠাকুরমহাশয়ের দুইটি নাটকের মধ্যে একটি ভাঙ্গাইয়া, কবিতা ও গানে রূপান্তরিত করিয়া এইগুলি রচিত। তন্মধ্যে প্রথম নাটকটি প্রথম যৌবনে প্রণীত ও মহাভারত-প্রণোদিত। দ্বিতীয়টিই সম্প্রতি আলোচ্য। সেটির চেহারা সম্পূর্ণ আধুনিক এবং উল্লিখিত কবিতাশ্রেণীর সহিত একভাবে অনুপ্রাণিত বলিয়া বোধ হয়। তাহার নাম "ডাকঘর"। ইহাতে আমরা একটি রুগ্ন বালকের সাক্ষাৎ পাই। সে রাজার চিঠি পাইবার উদ্বিগ্ন আশায় ও প্রতীক্ষায় জীবন ধরিয়া রহিয়াছে। ছেলেটি জানলার ধারে বসিয়া থাকে ও পথিকদিগকে প্রশ্ন করে। তাহারাও কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে,—প্রথমে কিঞ্চিৎ অনিচ্ছার সহিত; কিন্তু অনতিবিলম্বে সেই বালসুলভ কথোপকথন তাহাদের মনের ভার লাঘব করে। তাহারা স্পষ্টতঃ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া যায়। এই যে চিঠির জন্য ছেলেটি অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে, সে চিঠি আসে, আসে, আসে না। অবশেষে যখন ছেলেটি মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত তখন রাজা নিজে তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি

নিজের পরিচয় দেন না, কিন্তু সে তাঁহাকে চিনিতে পারে। নিম্ন-লিখিত ছোট কবিতাটি যেন উক্ত অপূর্ব্ব নাটকের পৃষ্ঠাপার্শ্বে লিখিত বলিয়া সহজেই অনুমান করা যায়।

"আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ"

—গীতিমাল্য (৭)

এটি যে কবিতাশ্রেণীভুক্ত, তাহাতে প্রতীক্ষার সকলপ্রকার দশা বা রূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে। কতকগুলি শ্লোক এমন-একটি অন্তরঙ্গ সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত, যে, সেগুলি কখন কখন Bachএর এক একটি সুর মনে করাইয়া দেয়। (XLV, XLVI, XLVII, এবং XL,)

এক একবার মনে হয় যে, এ প্রতীক্ষা প্রেমাস্পদের আগমনের প্রতীক্ষা; কিন্তু দেখিতে দেখিতে আবার তাহা উদ্বেলিত আধ্যাত্মিক রসে পরিণত হয়। এই কবিতাগুলির কোন কোনটিতে সহসা একটি স্ত্রীলিঙ্গ সর্ব্বনাম দেখিয়া আমরা ধরিতে পারি যে বক্তা স্ত্রীলোক। কিন্তু এই কবিতার শ্রেণী যে কোথায় আরম্ভ ও কোথায় শেষ, তাহার কোনরূপ চিহ্ন নাই; এবং যেহেতু ইংরাজী ভাষায় বক্তা স্ত্রী কি পুরুষ সে কথা অনেকক্ষণ চাপিয়া রাখা যায় সেই জন্য ফরাসী-অনুবাদকের সময়ে সময়ে মুস্কিলে পড়িতে হয়। কেননা ফরাসী ভাষার ব্যাকরণে পদসমূহের সঙ্গতির নিয়ম অধিকতর সুনির্দ্দিষ্ট। কিন্তু আসল কথা এই যে, এ স্থলে গানগুলি সেই আত্মার গান, যাহার কোন লিঙ্গ নাই।

"কথা ছিল একতরীতে কেবল তুমি আমি"

—গীতাঞ্জলি (৮৪)

এক্ষেত্রে সহজেই বোঝা যায় যে, যে নৌ-যাত্রার কথা হইতেছে, তাহা আধ্যাত্মিক যাত্রা, অথবা সেই যাত্রা যাহার উদ্দেশে কবি Baudelaire বলিয়াছেন :—"হে মৃত্যু! বৃদ্ধ কাপ্তেন, এবার নোঙর তোল",—'সময় হয়েছে নিকট, এবার বাঁধন খুলিতে হবে।' ইহারই প্ররোচনায় ঠাকুর-কবির সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর এবং অভিনব গীতিকবিতা রচিত, যদিও Baudelaireএর ভাবের সঙ্গে তাঁহার ভাবের কিছুমাত্র মিল নাই।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা আলোচ্য পুস্তকের কেন্দ্রস্থলে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এবং আশপাশের খণ্ড-কবিতাকে তফাৎ করিয়া দিয়াছি। জীবনের নিকট বিদায়সূচক কবিতা বাদে এখন আমার সমুখে যাহা আছে, তাহা প্রায় সবই অতীন্দ্রিয়-জগতের বস্তু।

তবু, এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে, আমি আবার আলোকের দুইটি স্তব পাঠ করিতে চাহি,—সেগুলি এত সুন্দর যে ভোলা যায় না। এ পুস্তকে এ দুইটি স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে, কিন্তু একত্র করাই যেন স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় :—

"কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো"
"আলো আমার আলো"

এই খণ্ড-কবিতাযুগ্ম যে পরস্পরসম্বদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি বলিয়াছি, এগুলি একত্র করা স্বাভাবিক; কিন্তু আবার বলি, না,—যেটি যেখানে আছে সেইখানে থাকাই ভাল। প্রথমটি এখনো আকুলতাপূর্ণ; ইহা সেই শ্রেণীতেই থাকুক্ যাহাতে আত্মার উদ্বিগ্ন ব্যাকুল প্রতীক্ষার ভাব প্রকটিত; যেন জীবাত্মা এখনো পরমাত্মাকে মায়ার এপারে খুঁজিয়া ফিরিতেছে,—এখনো তাঁহার সহিত যুক্ত

হইতে পারে নাই। দ্বিতীয়টি ব্রহ্মানন্দে উদ্বেলিত অন্তরাত্মার বিজয় সঙ্গীত।

এই যে আকুল আনন্দ, উৎসের ন্যায় উৎসারিত ও বিচ্ছুরিত হইতেছে, দিবসের ন্যায় আলোক ও উত্তাপ দিতেছে,—ইহার গোপন রহস্য কি? এই সত্য কি?—যাহা আত্মাকে একাধারে পুষ্ট ও মত্ত করিয়া তোলে? ইহা কি ব্রাহ্মণ্য দর্শনশাস্ত্রের ফল? ইহা কি বৈষ্ণব ধর্ম্ম? না, তাহা নহে; ইহা সেই শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ, সেই ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ। কারণ, যে গ্রন্থে তাঁহার বক্তৃতা সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন:—

"পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলসূত্রগুলি কেবলমাত্র প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাবৃত্ত হিসাবে আদরণীয়, কিন্তু আমাদের নিকট তাহা প্রাণসম মূল্যবান।"

এ কবিত্বের এই যে ব্যগ্র প্রাণপূর্ণ ভাব,—ইহাতেই আমি যুগপৎ হাসি ও কান্নায় অভিভূত হই। যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে আমরা কেবলমাত্র জ্ঞানপ্রধান ও তত্ত্বসর্ব্বস্ব মনে করিয়া থাকি, এই কবিতায় যেন তাহাকে প্রাণের স্পর্শে কম্পিত এবং হৃদয়ের আবেগে স্পন্দিত করিয়া তুলিয়াছে। Pascal তাঁহার "Mystere de Jesus"তে যে ব্যাকুল স্পন্দনের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাও সেই জাতীয়,—ইহা কেবল আনন্দের স্পন্দন।

"যেন শেষ গানে মোর সব রাগিণী পূরে"

—গীতাঞ্জলি (১৩৫)

বিশ্বপ্রাণের অনুভূতি, এবং সেই প্রাণে যোগ দিবার অনুভূতি হইতে এ আনন্দ স্বতঃই উৎপন্ন হয়।

"এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়।"

—নৈবেদ্য (২৩)

প্রথমে আমরা ইহাতে একটি অদ্বৈত ভাব ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাই না। দ্বিতীয় Faustএর আরম্ভেই যে জাগরণ-ব্যঞ্জক উক্তি আছে, তাহাতে আমরা ইতিপূর্ব্বেই এই একই ভাবের সুন্দর প্রকাশ দেখিয়াছি :—

"ঊষাদেবীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিবার জন্য জীবনের স্পন্দনে নূতন বেগের সঞ্চার হইয়াছে। হে ধরণী! তুমিও গতরাত্রে সমভাবেই অবস্থান করিয়াছিলে, এখন আমার পদতলে বিশ্রামান্তে নূতন প্রাণবায়ুর নিঃশ্বাস লইতেছ, এবং ইহারই মধ্যে আমাকে ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন করিতেছ। এই মহৎ সঙ্কল্প তুমি আমার মনে জাগরিত এবং উদ্দীপিত করিতেছ,—যেন শ্রেষ্ঠতম জীবন লাভে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকি।"

অন্যত্র, পর্ব্বত হইতে নির্ঝর ঝরিয়া পড়িতে দেখিয়া Faust যে স্বগতোক্তি করেন, তাহার শেষভাগে বলিতেছেন :—

"সোপান হইতে সোপানান্তরে নির্ঝরিণী ঝরিয়া পড়িতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শতসহস্র ধারায় বিভক্ত হইতেছে, উচ্ছ্বসিত ফেণপুঞ্জ বাতাসে উচ্চৈঃস্বরে বাঁশী বাজাইতেছে। কিন্তু এই ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য হইতে উদ্ভূত, পরিবর্ত্তনশীল, বিচিত্রবর্ণ ইন্দ্রধনু কি-অপরূপ ভঙ্গীতে হেলিয়া রহিয়াছে;—কখন পরিচ্ছিন্নরূপে অঙ্কিত,

কখন বাতাসে মিলিতপ্রায় হইয়া চতুর্দ্দিকে একটি স্নিগ্ধ বাষ্পময় হিল্লোল বিস্তার করিতেছে। ইহাই যে মানবশক্তির প্রতিচ্ছায়া—এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে তুমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে :—এই রঙীন প্রতিবিম্বই আমাদের জীবনের প্রতিচ্ছবি।"

হিন্দুধর্ম্ম যাহাকে মায়া বলে, তাহা এই রঙীন প্রতিবিম্বেরই অনুরূপ। কিন্তু ঠাকুরমহাশয় যে আনন্দের ব্যাখ্যা করেন, মায়ার পরপারেই তিনি তাহার দর্শন লাভ করিয়াছেন; এবং যতক্ষণ তিনি এই রঙীন প্রতিবিম্বের ওপারে, এই দোদুল্যমান ঘটনা-যবনিকার অন্তরালে তাঁহার দেবতাকে খুঁজিয়া ফিরিতেছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার অন্তরাত্মা তৃষিত হইয়া ছিল।

"যে দিন ফুট্‌ল কমল"

—গীতিমাল্য (১৭)

* * *

জীবনের তাৎপর্য্যসম্বন্ধে ঠাকুরমহাশয়ের কি মতামত, সে তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিবার যোগ্যতা আমার নাই, এবং থাকিলেও আমি সে চেষ্টা করিতাম না,—সংক্ষেপেও নহে। তাহার একটি বিশেষ কারণ এই যে, তিনি উপনিষদের ধর্ম্মতত্ত্বের কোনপ্রকার বদল করিতে, বা তাহাতে কোনপ্রকার অভিনবত্ব আরোপ করিতে সম্পূর্ণ নারাজ। এবং সে ধর্ম্মতত্ত্ব আর যাহাই হউক্, নূতন একেবারেই নহে। সুতরাং এ স্থলে আমি সে তত্ত্বের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে বসি নাই। কিন্তু ঠাকুরমহাশয় যে আবেগদ্বারা তাহা সঞ্জীবিত করিয়াছেন, ও যে নিখুঁত নৈপুণ্যের সহিত তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই আমি মুগ্ধ।

তাঁহাকে ভগবানের প্রয়োজন আছে, এ কথা ঠাকুরমহাশয় জানেন। তিনি কবি হইয়া যে বাঁশীকে নিজের ফুৎকারে অনুপ্রাণিত করিতেছেন, নিজেকে ভগবানের হাতে সেই বাঁশীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বরকে "আমার কবি",—কখন কখন "কবিগুরু" বলিয়া সম্বোধন করেন; তিনি নিজে এবং মানুষ মাত্রই এই কবিগুরুর জীবন্ত কবিতা। তিনি বলেন, "আমি যেন আমার জীবনকে ঋজু ও সরল করিয়া, একটি বাঁশীর মতন করিয়া তুলিতে পারি; সেই বাঁশীটি তুমি গানে ভরিয়া দাও, এইমাত্র চাই।"

ভগবান নিজের সৃষ্টিতে, নিজসৃষ্ট জীবে নিজেকে উপলব্ধি করেন। কবি যেন ঈশ্বরের চৈতন্য হইতে পারেন, বা বস্তুতঃ তিনি সেই চৈতন্য—এই ভাবের দ্বারা তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতা অনুপ্রাণিত।

যে কবিতায় মায়ার সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, এবং মায়ার আবরণ ভেদপূর্ব্বক জ্ঞানের মর্ম্মস্থল উদ্ঘাটন করা হইয়াছে, সে কবিতাগুলিও নিখুঁত।

ঠাকুরমহাশয়ের যে ব্যাখ্যানগুলি সম্প্রতি "সাধনা"-নামে পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে এমন অনেক বাক্য আছে যাহা উল্লিখিত কবিতার টীকাস্বরূপ। তাহার একটি দৃষ্টান্ত "প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি" শীর্ষক পরিচ্ছেদের শেষাশেষি দেখিতে পাওয়া যায়।

"বাস্তবিক ইহা কি অতি আশ্চর্য্য নহে যে, প্রকৃতিতে একই সময়ে যুগপৎ দুইটি বিরোধী-ভাবের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়,—একটি অধীনতার, অপরটি স্বাধীনতার।

একদিকে প্রকৃতির শ্রম ও চেষ্টার মূর্ত্তি, অপরদিকে অবকাশের মূর্ত্তি দেখিতে পাই। বাহিরে প্রকৃতি অবিশ্রান্ত কর্ম্মশীল; অন্তরে প্রকৃতি সম্পূর্ণ শান্ত ও নিস্তব্ধ।"

ইহাই কি নিম্নলিখিত কবিতাটির ভাবার্থ নহে?

"একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়"

নৈবেদ্য (৮১)।

আমি শেষে যে-কয়টি কবিতার উল্লেখ করিয়াছি সবগুলিই এই দ্বৈতভাব-প্রণোদিত। "সাধনার" একটি সুন্দর অংশ এই ভাবের সুনিপুণ টীকাস্বরূপ:—

"দৃষ্টান্তস্বরূপ ধর,—ফুল। ফুল যতই সুন্দর দেখিতে হউক্ না কেন, সে একটি মস্ত কাজে ব্যস্ত। তাহার গড়ন ও রং কেবলমাত্র সেই কাজেরই উপযোগী। তাহার হাতে নির্ব্বিঘ্নে ফল ফলানোর ভার; নহিলে গাছের জীবনের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়, ও পৃথিবী অচিরে মরুভূমিতে পরিণত হয়। ফুলের রং এবং গন্ধ শুধু এই কারণেই। যেমনি মৌমাছিদ্বারা তাহার গর্ভাধান হয়, অমনি ফলের সময় আসে, অমনি তাহার পেলব পাপড়ি ঝরিয়া পড়ে, এবং প্রাকৃতিক মিতব্যয়িতার নিষ্ঠুর নিয়মে সে তাহার সুমধুর গন্ধ বর্জ্জন করিতে বাধ্য হয়। সূর্য্যের আলোকে রূপের বাহার-দিবার অবকাশ আর তাহার নাই; তাহার দ্বারা কার্য্য উদ্ধার হইয়া গিয়াছে।

বাহিরের দিক হইতে দেখিলে মনে হয় প্রকৃতির প্রত্যেক কার্য্য একমাত্র প্রয়োজনের শাসনেই সম্পন্ন হয়;—তাহারই

তাগিদে কুঁড়ি ফুলের দিকে অগ্রসর হয়; ফল মাটিতে বীজ বপন করে; বীজ পুনশ্চ অঙ্কুরিত হয়; এবং এইরূপে কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরপ্রবাহ নিরবচ্ছিন্নধারায় ধাবিত হইতে থাকে।

কিন্তু এই একই ফুলকে মানুষের হৃদয়ের দিক হইতে দেখ,—তৎক্ষণাৎ তাহার কার্য্যের প্রয়োজনীয়তার কোন কথাই আর উঠিবে না; সে তখনি বিরাম ও অবকাশের প্রতিমূর্ত্তিরূপে প্রতিভাত হইবে। অতএব যে বস্তুদ্বারা অনন্ত উদ্যমের প্রকাশ হয়, সেই একই বস্তু অপরদিকে শান্তি ও সৌন্দর্য্যের অখণ্ড প্রতিরূপ।"

Schopenhauer "উদ্যমশীল" ও "শান্তিশীল" এই উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, এখানে আমরা সেই পুরাতন পার্থক্যের আভাস পাই। অবশ্য এই দ্বৈতভাব সদাসর্ব্বদা উপলব্ধি করিতে পারাই বড় কম কথা নহে। কিন্তু ঠাকুরমহাশয়ের বক্তব্য এই যে, তিনি মায়ার ও-পারে একটি মহত্তর আনন্দের নাগাল পাইয়াছেন,—কারণ তিনি "সাধনায়" বলেন:—

"আমাদের জীবনের যে-দিক অনন্তের অভিমুখী, তাহা ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা রাখে না, তাহা স্বাধীনতা ও আনন্দের প্রত্যাশী। এইখানেই প্রয়োজনের রাজ্য শেষ হয়,—এখানে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য পাওয়া নয়,—হওয়া। কি হওয়া?—না, ব্রহ্মের সহিত এক হওয়া,—কারণ অনন্তের ধর্ম্ম মিলনের ধর্ম্ম। সেই জন্যই আমরা উপনিষদে দেখিতে পাই 'যিনি ঈশ্বরকে জানেন তিনি সত্য হয়েন।' পাওয়ার সীমানা ছাড়াইয়া এইখানে হওয়ার সীমানায় আসিয়া পৌঁছানো যায়। যেমন, কথার অর্থ যখন

জানিতে পারি তখন কথা যে বেশি বড় হয় তাহা নয়, কিন্তু সত্য হইয়া উঠে,—তখন ভাবের সহিত ভাষা এক হইয়া যায়।

"যিনি পরম পিতার সঙ্গে নিজের ঐক্য নির্ভীকচিত্তে প্রচার করিয়াছিলেন, যিনি ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেরূপ পূর্ণ তোমরা সেইরূপ পূর্ণ হও,—সেই ব্যক্তিকে যদিও পাশ্চাত্য-জগৎ গুরু বলিয়া মানে,—তবুও অনন্ত সত্তার সহিত আমাদের ঐক্যভাব পাশ্চাত্য-জগৎ কখন সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নাই। মানুষের দেবত্বলাভের সকল দাবীই তাঁহারা পরম স্পর্দ্ধা বলিয়া নিন্দা করেন। কিন্তু যিশুখৃষ্ট কখনই তাঁহার উপদেশে এরূপ নিন্দাবাদ করেন নাই,—সম্ভবতঃ তাঁহার পরবর্ত্তী খৃষ্টীয় সাধুগণও এই ভাবের সমর্থন করেন নাই। অথচ ক্রমশঃ এই ভাবই পাশ্চাত্য খৃষ্টধর্ম্মে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।"

অপরপক্ষে, ভগবানের সঙ্গে এই ঐক্যের ভাব হিন্দুদের মধ্যে এমন প্রবল যে, আমার প্রবন্ধের প্রথম-অংশে ঋগ্বেদের একটি ঋকের যে সুন্দর পদটি আবৃত্তি করিয়াছিলাম, তাহার রচয়িতা যে ঋষি তিনি "প্রজাপতি"-বলিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন; —অর্থাৎ তিনি যে নূতন দেবতার স্তব করিতেছেন, সেই জীবেশ্বর প্রজাপতির নামে নিজের নামকরণ করিয়াছেন। "সাধনার" আর-এক স্থলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"যখন এই ঐক্যের পূর্ণতা-বোধ কেবলমাত্র বুদ্ধিগত নহে, যখন তাহা বিশ্বের সমগ্রতাসম্বন্ধে আমাদের চিত্তকে জাজ্বল্যমানরূপে সচেতন করিয়া তোলে, তখনই আনন্দ বিকীর্ণ হয়, ও প্রেম বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়ে।"

গীতাঞ্জলির নিম্নলিখিত কবিতাটিতে তিনি ব্রহ্মের সহিত এই প্রকার পুনর্ম্মিলনে লীন হইবার কথাই বলিয়াছেন :—

"আমি শরৎ শেষের মেঘের মত তোমার গগনকোণে"
"লীলা"—খেয়া।

এইখানেই, এই "স্বচ্ছ শুদ্ধ স্নিগ্ধতার মধ্যে" জীবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুঃখ কষ্ট ভাবনা চিন্তা ও ভালবাসা সবই লীন হইয়া যায়।

"আমার ঘরেতে আর নাই
সে যে নাই"—"স্মরণ"।

গীতাঞ্জলির শেষ-কবিতা-কয়টি সবই মৃত্যুর স্তব। ইহাপেক্ষা গভীর ও সুন্দর সুর আমি কোন দেশের কোন সাহিত্যে শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।*

আঁদ্রে গীদ্

*রবীন্দ্রনাথের গীত ইউরোপের মনের কোন্ তার স্পর্শ করেছে—তা জানবার জন্য আমাদের অনেকের মনে বিশেষ কৌতূহল জন্মে। বর্ত্তমান যুগের একটি খ্যাতনামা ফরাসী লেখক এ বিষয়ে যে আলোচনা করেছেন তার থেকে আমরা ইউরোপের নব-মনোভাবের কতকটা পরিচয় পাই। এই কারণে আঁদ্রে গীদ্ তাঁহার কৃত গীতাঞ্জলির অনুবাদের যে ভূমিকা লিখেছেন তার বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশ করছি। বলা বাহুল্য, অনুবাদমাত্রেই মূলের সৌন্দর্য্য রক্ষা করা কঠিন, এবং ফরাসী ভাষার রচনারীতি বঙ্গভাষায় রক্ষা করা বিশেষরূপে কঠিন সুতরাং ভাষান্তরে রূপান্তরও ঘটেছে।

সম্পাদক।

তেপাটি *

(Triolet)

ঊষা

ঊষা আসে অচল শিয়রে
তুষারেতে রাখিয়া চরণ।
স্পর্শে তার ভুবন শিহরে
ঊষা হাসে অচল শিয়রে,
ধরে বুকে নীহারে শীকরে
সে হাসির কনক বরণ।
বসো সখি মনের শিয়রে
হিমবুকে রাখিয়া চরণ ॥

মধ্যাহ্ন

আকাশের মাটি-লেপা ঘরে
রবি এবে দেয় আল্‌পনা।
দেখ সখি মেঘের উপরে
কত ছবি আঁকে রবিকরে।
কত রঙে কত রূপ ধরে
ছবি যেন কবি-কলপনা।
বুক মোর আছে মেঘে ভরে
তাহে সখি দাও আল্‌পনা ॥

* সবুজপত্রে "অনার্য্য বাঙ্গালী"-নামক প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র বসু (আই, সি, এস) বাঙ্গলায় একটি Triolet রচনা করে নমুনাস্বরূপ সেটি আমাকে পাঠিয়ে দেন। সেই নমুনা-অনুসারে আমি এই কবিতাগুলি লিখেছি। "তেপাটি" নামও তাঁরই দত্ত। সুতরাং এই কবিতাগুলির নাম ও রূপের জন্ত আমি তাঁর নিকট সম্পূর্ণ ঋণী। প্র—চৌ

সন্ধ্যা

দেখ সখি দিবা চলে যায়
লুটাইয়া আলোর অঞ্চল,
পিছে ফেলে অবাক নিশায়
দেখ সখি আলো চলে যায়।
বিশ্ব এবে আঁধারে মিশায়
তাই বলে হয়োনা চঞ্চল!
বেলা গেলে সব চলে যায়
গুটাইয়া আলোর অঞ্চল ॥

মধ্যরাত্রি

দেখ সখি আঁধারের পানে
চেয়ে আছে দুটি শুভ্রতারা,
দুটি শিখা বিকম্পিত প্রাণে
চেয়ে আছে স্থিররাত্রি পানে।
আঁধারের রহস্যের টানে
দুটি আলো হয়ে আত্মহারা।
রেখো সখি জ্বেলে মোর প্রাণে
আলোভরা দুটি কালো তারা ॥

১০ই অক্টোবর ১৯১৪
কার্সিয়ং

মিলন

জান সখি কেন ভালবাসি
ওই তব ফোটা মুখখানি
ওই তব চোখভরা হাসি
জান সখি কেন ভালবাসি ?
যবে আমি তোমা কাছে আসি
ঠোঁটে মোর ফোটে দিব্যবাণী।
তাই সখি আমি ভালবাসি
ওই তব গোটা মুখখানি ॥

বিরহ

বলি তবে কেন চলে যাই
শুনে যেন মরমে কেঁদনা।
দুঃখ দিতে দুঃখ পেতে চাই
তাই সখি তোমা ছেড়ে যাই।
আমি চাই সেই গান গাই
সুরে যার উছলে বেদনা।
তাই যবে দূরে যেতে চাই
সখি মোরে থাকিতে সেধনা ॥

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

৩১শে অক্টোবর
কার্সিয়ং